দাম : ষোলো টাকা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন : এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মহাকাব্য— পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

আগামী পঞ্চাশ বছর হোক বাঙ্গালির নয়া অভ্যুদয়-যুগ — পৃঃ ১৩

৭৮ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ১৮ মে, ২০২৬।। ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

সুশাসনের প্রত্যাশায় রাজ্যবাসী

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১৮ মে - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

আমাদের যাত্রা হলো শুরু, তাই বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরবো না গো আর : 'ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার' ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা উন্নয়নের নবদিগন্ত ও বাস্তবতার মেলবন্ধন ☐ সৌরদীপ রায় ☐ ৭

বনাঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে ক্রীড়া সাফল্য ☐ দ্রৌপদী মুর্মু ☐ ৮

চন্দ্রনাথ হত্যা কি রাজ্যকে অশান্ত করার লক্ষ্যে বিদায়ী শাসক দলের নতুন কোনো ছক? ☐ জাহ্নবী রায় ☐ ১০

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন : এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মহাকাব্য ☐ পুলক নারায়ণ ধর ☐ ১১

আগামী পঞ্চাশ বছর হোক বাঙ্গালির নয়া অভ্যুদয়-যুগ ☐ জ্যোতির্ময় গোস্বামী ☐ ১৩

ভোট : ২০২৬—ভেঙেছ দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময় তোমারই হউক জয় ☐ সুজিত রায় ☐ ১৫

আজ পশ্চিমবঙ্গ জিতেছে, আগামীতে কেরলম জিতবে ☐ সোমনাথ গোস্বামী ☐ ২০

ব্রিগেডে মহাসমারোহে রাজ্য মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ☐ ২৩

বিস্মৃতপ্রায় বঙ্গের প্রথম সম্রাজ্ঞী রানি ভবানী ☐ জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ ☐ ৩১

ত্রিপুরা রাজাদের অকৃপণ অবদানে গড়া কুমিল্লার ইতিহাস ও সংস্কৃতি ☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ৩৪

এই নির্বাচন শুধু বিজেপির জয় নয়, দেশের সুরক্ষা ও সত্যের জয় ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৩৭

ধর্মযুদ্ধে একনায়কতন্ত্র ও তোষণনীতির পতন ☐ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ☐ ৪৩

নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারের কী কী করণীয় ☐ বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় ☐ ৪৫

নির্বাচনে জয়ে নায়ক বিজেপির টিমওয়ার্ক ☐ প্রদীপ মারিক ☐ ৪৮

মুসলমান ভোটে প্রাণ স্পন্দন শুরু হয়েছে সিপিএমের ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯** ☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **রঙ্গম : ৩৯** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ☐

প্রকাশিত হবে
২৫ মে
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৫ মে
২০২৬

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী

ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের অকুতোভয় যোদ্ধা, যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ বড়লাটের ওপর বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা করে ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে নেতাজীকে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছিলেন তিনি মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সুশাসনের প্রত্যাশা
রাজ্যকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করা

পশ্চিমবঙ্গে অপশাসনের অবসান ঘটিয়াছে। রাজ্যবাসীর অপরিসীম প্রত্যাশার উপর দাঁড়াইয়া ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন শুভেন্দু অধিকারী। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই নির্বাচনে জয় — ভারতীয় জনতা পার্টির একক জয় নহে, তাহা জাগ্রত জনতার জয়। সিপিএমের অপশাসন হইতে রক্ষা পাইতে রাজ্যবাসী তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, তাহারা রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে বড়ো বড়ো কথা বলিলেও মূলত গুন্ডারাজ কায়েম করিয়া রাজ্যবাসীকে শুধুমাত্র লুণ্ঠন করিয়াছে এবং এমন নৈরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল যে, শুধু ভারতেই নহে, সমগ্র বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঙ্গালির ভাবমূর্তি ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। রাজ্যবাসী তাহা হইতে মুক্তি চাহিতেছিল। পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। নির্বাচনের পূর্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পনেরো বৎসরের অপশাসনের বিষয়ে রাজ্যবাসীকে সাবধান করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা তৃণমূল দল পরিচালিত সরকারের অপশাসনে কীরূপ ও কী পরিমাণে অরাজকতার শিকার হইয়াছেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, রাজ্য জুড়িয়া সীমাহীন দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির কথা, বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নহে, সমগ্র ভারতে কীভাবে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতেছে তাহার কথা, নারীর নিরাপত্তাহীনতার কথা। তাহার ফলে মানুষ সতর্ক হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতীয় জনতা পার্টি যে সংকল্পপত্র প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতেও বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়িবার লক্ষ্যে ভয়মুক্ত প্রশাসনের অঙ্গীকারের কথা ছিল। তাহাদের প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল, ছয়মাসের মধ্যেই রাজ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) প্রচলন, চা-বাগানের পুনরুজ্জীবন, স্বচ্ছতার সহিত শূন্যপদে নিয়োগ, কর্মহীনদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ, অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ, পিএম বিশ্বকর্মা, পিএম কুসুম, উজ্জলা-৩ এবং খেলো ইন্ডিয়ার ন্যায় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সতর্ক ও আশ্বস্ত হইয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলত, রাজ্যে পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহার মর্যাদা নবনির্বাচিত সরকারকে রাখিতে হইবে। পনেরো বৎসরের অপশাসনের বিপরীতে একটি উন্নত ও নিরাপদ রাজ্য রূপে পশ্চিমবঙ্গকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত নূতন সরকার যে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা পূরণে বদ্ধপরিকর তাহা মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই অনুভূত হইয়াছে। প্রথম দিনেই তাহারা তৃণমূল গুন্ডাদের হাতে নিহত বিজেপি কর্মীদিগের পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে; সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে ৪৫ দিনের মধ্যে জমি প্রদানের সুব্যবস্থা করিয়াছে; রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প-সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করিয়াছে; বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও এবং বিশ্বকর্মা যোজনার ন্যায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যকে যুক্ত করিয়াছে; রাজ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতাকে কার্যকর করিয়াছে এবং সরকারি চাকুরিপ্রার্থীদের আবেদনের বয়সসীমা পাঁচ বৎসর বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের জন্য ওএমআর শিট প্রকাশ করিয়া যোগ্য শিক্ষকদিগের সুবিচার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। একথা বলা যাইতেই পারে যে, মন্ত্রীসভার প্রথম অধিবেশনেই রাজ্যবাসী সুশাসনের আভাস পাইয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, নূতন সরকারের সম্মুখে বিস্তর চ্যালেঞ্জও রহিয়াছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার রাজ্যে ৭ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকার ঋণ রাখিয়া গিয়াছে। তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ছদ্ম-বিজেপি সাজিয়া বিভিন্ন স্থানে মানুষের উপর আক্রমণ করিয়া নূতন সরকারের বদনাম করিতে শুরু করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি এবং নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তাহা কঠোর হস্তে দমন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। রাজ্যবাসীর আশা যে, নবনির্বাচিত সরকার সুশৃঙ্খল সুশাসন প্রবর্তনপূর্বক অচিরেই রাজ্যবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে অতি দ্রুত জাতীয় স্তরে উন্নীত করিবে। রাজ্যবাসীকেও সতর্ক থাকিতে হইবে, বিভেদকামী শক্তি যেন এই রাজ্যে কোনোপ্রকারে মাথা তুলিতে না পারে। পশ্চিমবঙ্গের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করিবার জন্য রাজ্য সরকারের সহিত জাগ্রত জনতাকেও সজাগ থাকিতে হইবে।

সুভাষিতম্

ত্যজেদ্ধর্ম দয়াহীনং বিদ্যাহীনং গুরুং ত্যজেৎ।
ত্যজেৎক্রোধমুখীং ভার্যা নিঃস্নেহান্ বান্ধবাংস্ত্যজেৎ।।

অর্থঃ দয়াহীন ধর্ম ত্যাগ করা উচিত, বিদ্যাহীন গুরু ত্যাগ করা উচিত, ক্রোধী ভার্যা ত্যাগ করা উচিত এবং প্রেমরহিত বন্ধু ত্যাগ করা উচিত।

আমাদের যাত্রা হলো শুরু তাই বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরব না গো আর

‘ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় জনতা পার্টি-ই (বিজেপি) যে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ, ভবিতব্য আর ভরসা সেই বিষয়টি বিগত ৫ বছর ধরে রাজ্যপাটে লেখা চলছিল। ২০২১-এর আগস্ট মাসে যে কাজ শুরু হয়েছিল গত ৯ মে তা সম্পন্ন হয়েছে। গঠনমূলক কাজ আরও বাকি। গণতন্ত্রের কর্ণধার সাধারণ মানুষ আর ভোটাররা বিজেপিকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে এনেছেন। আগের শাসক দলের সবচাইতে ভালো ফলকেও বিজেপি ছাপিয়ে গিয়েছে। তারা প্রায় ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট পেয়েছে। পুরোনো শাসক দল ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ভোট পেয়েছিল। বিজেপি আর আগের শাসকের ভোটের ফারাক প্রায় ৩২ লক্ষ। এই নির্বাচনে ২ কোটি ৬০ লক্ষ ভোট পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ভোট পেয়েছে প্রায় ৪৬ শতাংশ আর পুরোনো শাসক ৪১ শতাংশ। নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাই যথার্থ বলেছেন ২০৩১-এর ভোটে ৬০ শতাংশ ভোট পেতে হবে। দেশ ও রাজ্যের প্রধান রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক শক্তির তাতে পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, ফলে দেশের অগ্রগতি সুনিশ্চিত হবে। সকলের উন্মেষ ঘটবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’-এর আহ্বান বাস্তবায়িত হবে।

এবারের ভোটে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ১১২টি মুসলমান অধ্যুষিত আসনের মধ্যে বিজেপির ৩৪টি অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জয়। বরাবরের মতো এবারেও বিজেপি কোনো মুসলমান প্রার্থী দেয়নি। রাজ্যে ৭৪টি মুসলমান-অধ্যুষিত বিধানসভা আসনেও থাবা বসিয়েছে বিজেপি। রাজ্যে হিন্দু সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন বিধানসভা আসন সংখ্যা হলো ১৮২, যার অধিকাংশই বিজেপি জিতেছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ আর উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলায় মুসলমান-অধ্যুষিত আসনে বিজেপি-র এই অসাধারণ জয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’-এর বার্তাই বহন করে। প্রমাণ হয়েছে যে, আগের সরকার এরাজ্যের মুসলমানদের ভুল বোঝাত। ক্রমাগত মিথ্যাচার করে তারা মুসলমান সম্প্রদায়কে ভোটের তেজপাতা বানাত। তবে সবচাইতে উল্লেখ্যযোগ্য হলো— ৯টি জেলায় বিগত ১৫ বছরের শাসক দলের ধুয়ে সাফ হয়ে যাওয়া। সে মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করার মতো দলীয় কর্মী তাদের নেই। একটি হাস্যকর পোস্টমর্টেম কমিটি তারা বানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই সাফ হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী আগেই করেছিলেন। প্রথম দফার ১৫২টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১১৬ টি (প্রায় ৭৪ শতাংশ) আর পরের দফায় ১৪২টি আসনের ভিতর ৯১টি (প্রায় ৬৪ শতাংশ) আসন পায়। তারা এবার বিধানসভার ৭০ শতাংশ আসনে জয়ী হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু শক্তি বামপন্থীরা প্রাপ্ত ভোট শতাংশের বিচারে আরও ক্ষয়ে গেলেও কোনোক্রমে একটি আসন জিতে খাতা খুলেছে। এরাজ্যে ১৯৫টি আসনে লড়ে ১৮৫টি আসনে তাদের জামানাত জব্দ হয়ে গিয়েছে। ৮৯টি আসনে তারা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। কংগ্রেসের তো ‘হতোদ্যম’ অবস্থা। ৭ শতাংশ ভোট— ৪ শতাংশ নেমে ৩ শতাংশে হয়ে গিয়েছে। যদিও তারা দু’টি আসন পেয়েছে। ভোটের ফলাফল প্রমাণ করছে এই মুহূর্তে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করার কোনো যুৎসই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

আগের শাসক জোড়া-তাপ্পি দিয়ে রাজ্য চালাত। তাপ্পি খুলে যাওয়ায় পুরোনো শাসকের ভরাডুবি হয়েছে। তবে বিজেপির ওপর মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে। পাশাপাশি এরাজ্যের নবনির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব অনেকটা বেড়েছে। রাজ্যের মৌলিক উন্নয়ন বিজেপি-কে করতেই হবে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর ‘টিম’-কে সেই বার্তা দিয়েছেন। জানিয়েছেন ‘আমি নয় আমরা’ হিসাবে কাজ করতে হবে। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের উচ্ছিষ্টে তৈরি হওয়া আগের শাসক তার ব্যক্তিগত স্বজনপোষণ আর দুর্নীতি করে রাজ্য চালাচ্ছিল। সে অবৈধ ক্ষমতার গঙ্গাযাত্রা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। রাজ্যের বহুলাংশে সচেতন হিন্দু ভোটার সেই যাত্রা সুনিশ্চিত করে । পশ্চিমবঙ্গকে যারা ‘পশ্চিম-বাংলাদেশ’ বানাতে চেয়েছিল এই ভোটে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সে পাপকে আর কোনোদিন ফিরতে দেওয়া চলবে না। নতুন শক্তিকে তা নিশ্চিত করতে হবে। জেহাদি শক্তি দুর্বল নয়। তারা কিন্তু সক্রিয়। ভোটের পরেই শুভেন্দুবাবুর আপ্ত সহায়কের হত্যা তার প্রমাণ । এই আক্রমণ আগামীর লাল সংকেত। বিজেপি পরিচালিত নতুন রাজ্য সরকারকে আগামী কয়েক বছর তাই অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতেই হবে। গত ৪ মে যে ‘মঙ্গলযাত্রা’ শুরু হলো আগামী কয়েক দশকে যে তা ক্ষয় হবে না তা হলফ করে বলা যায়। তবে সাধু সাবধান! ঝড়-তুফান যাই আসুক ফেরা চলবে না। জেহাদি শক্তিকে নষ্ট করে যে তরী ভাসিয়েছে ভোটার, তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আরো বেশি করে সেই ভোটার আর মানুষকে সঙ্গে পেতে হবে। নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়তে হবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর এটাই রাজ্যবাসীর অঙ্গীকার। *(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা

উন্নয়নের নবদিগন্ত ও বাস্তবতার মেলবন্ধন

সৌরদীপ রায়

গণতন্ত্রে ক্ষমতার পালাবদল বা নতুন সরকারের প্রতিষ্ঠা কেবল রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের আখ্যান নয়, বরং এটি কোটি কোটি মানুষের নতুন করে স্বপ্ন দেখার এবং আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা থেকে মুক্তির একটি সুবর্ণ সুযোগ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা যেমন বিপুল, তেমনই সরকারের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জও পাহাড় প্রমাণ। মানুষের দাবি আজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সর্বপ্রকারের উন্নয়ন হোক মূল অগ্রাধিকার, যেখানে কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত নয়, বরং সমন্বয়ের মাধ্যমেই হবে রাজ্যের প্রকৃত অগ্রগতি। যে রাস্তা, নতুন সরকার নির্বাচিত হওয়ার ফলে, খুবই মসৃণ হবে। কারণ বহু দশক পর পশ্চিমবঙ্গবাসী পেয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের নির্বাচিত সরকার।

রাজ্যের শিক্ষিত যুবসমাজের সবথেকে বড়ো আক্ষেপ হলো কর্মসংস্থানের তীব্র আকাল, যার ফলে মেধা পাচার বা 'ব্রেন ড্রেন' আজ এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এক সময় হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস যে শিল্পবিপ্লবের ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অমোঘ স্বপ্ন দেখিয়েছিল, পরবর্তীকালে সিঙ্গুরে টাটা ন্যানো কারখানার মর্মান্তিক প্রস্থান সেই সম্ভাবনার গতিতে সবচেয়ে বড়ো আঘাত হানে। বিগত কয়েক দশকে বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের অভাবে বেকারত্বের হার উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছেছে। মানুষ আজ চায় না কোনো অহেতুক, অকারণ বা অপ্রয়োজনীয় জমি আন্দোলন বা রাজনৈতিক অহমিকায় কোনো শিল্প ফিরে যাক। নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা, বিনিয়োগের জন্য একটি শিল্পবান্ধব পরিবেশ বা 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' নিশ্চিত করা। সিঙ্গুর, শালবনী, হলদিয়া বা অন্যান্য শিল্পতালুকে বৃহৎ শিল্পের চাকা যেন আবার ঘোরে এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়, এটাই যুবসমাজের প্রধান দাবি।

উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সমাজের নারীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। পূর্বতন রাজ্য সরকারের শাসনে আরজি কর কাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, প্রশাসন এবং নারী নিরাপত্তার ভঙ্গুর ভিতকে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করে দিয়েছে। এই নারকীয় ঘটনা রাজ্যবাসীর মনে যে গভীর ক্ষোভ ও সংশয় তৈরি করেছে, তা সহজে মোছার নয়। সাধারণ মানুষ শুধু কড়া আইনের আশ্বাস বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ চায় না, তারা চায় বিচার প্রক্রিয়ার দ্রুততা। রাস্তায়, গণপরিবহণে ও কর্মক্ষেত্রে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। নতুন সরকারের কাছে উচ্চ দাবি, প্রশাসন ও পুলিশকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে নারীদের জন্য এক নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ একটা পরিবেশ গড়ে তোলা হোক।

রাজ্যের জেলাগুলিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বহু মাল্টি- স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হলেও, সেগুলির কঙ্কালসার পরিকাঠামো ও পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স, জীবনদায়ী ওষুধ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে এই হাসপাতালগুলি মূলত 'রেফারেল সেন্টারে' পরিণত হয়েছে। ফলে, মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে মানুষকে আজও অগত্যা ভিন রাজ্যে ছুটতে হয়। পাশাপাশি, রাজ্যে আধুনিক মানের গবেষণা ও চিকিৎসায় পরিকাঠামোগত বিপুল অভাব মেটাতে আরও বেশি করে এইমস প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, যা কিনা রাজ্যবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবি। ডাক্তারি শিক্ষার ক্ষেত্রেও দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং যুগোপযোগী পরিকাঠামো গঠন রাজ্যবাসীর অন্যতম প্রধান প্রত্যাশা।

পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের একটি বড়ো সমস্যা হলো কেন্দ্র ও রাজ্যের অব্যাহত রাজনৈতিক সংঘাত। এই মতাদর্শগত লড়াইয়ের ফলে অনেক সময় কেন্দ্রীয় প্রকল্প, পরিকাঠামোগত অনুদান বা শিল্প সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে অহেতুক দেরি হয় বা থমকে যায়। রাজ্যবাসীর সুনির্দিষ্ট দাবি, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা 'কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম'- এর নীতি মেনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করুক। রাজ্যের নিজস্ব স্বতন্ত্র ক্ষমতা থাকুক, কিন্তু সেটার সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেন থাকে একটি অটুট অবিচ্ছেদ্য সমন্বয়।

মানুষের বিপুল প্রত্যাশা পূরণই যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি। কর্মসংস্থান থেকে নারী নিরাপত্তা, শিল্পায়ন থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা— প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ও স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা, স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। রাজনৈতিক সংঘাতের অন্ধকার পথ পরিহার করে গঠনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের হারানো আর্থ সামাজিক গৌরব পুনরুদ্ধার হোক এবং উন্নয়নের চাকায় আসুক গতি, এটাই আজ সময়ের সবচেয়ে বড়ো ও অমোঘ দাবি। পশ্চিমবঙ্গ ফিরে পাক তার হারানো গৌরব।

বনাঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে ক্রীড়া সাফল্য

আমাদের যুবকদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা যাদের মধ্যে জনজাতির যুবকরাও অন্তর্ভুক্ত, তারা আমাদের জাতীয় জীবনে, এক সামাজিক সম্পদ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জাতির এই অমূল্য সম্পদ আমরা যদি সঠিকভাবে লালন পালন করতে পারি তো আমরা অচিরেই বড়ো সাফল্য অর্জন করব।

দ্রৌপদী মুর্মু

আমি লক্ষ্য করেছি যে গ্রাম ও বনাঞ্চলের শিশুরা বাড়ির বাইরে প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে বেশি ভালোবাসে। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে খেলার সামগ্রী বানিয়ে নেয়। তারা নিজেদের মতো করে খেলার ময়দানে দাগ কেটে, নিজেদের প্রয়োজন মতো ময়দান সাজিয়ে নেয়। তারা খেলার সামগ্রী হিসেবে বিভিন্ন ফলের বীজ ব্যবহার করে। তারা বল তৈরি করে নেয় পাতা, গাছের মূল ব্যবহার করে। বাঁশ দিয়ে তারা হকি, ফুটবলের গোলপোস্ট তৈরি করে। এইভাবেই তারা তাদের খেলাধুলার সামগ্রী নিজেরাই তৈরি করে নেয়।

বহু শিশুই জার্সি, খেলার বুট ছাড়াই খেলাধুলা করে উৎসাহের সঙ্গে। ছোটো পুকুর বা দীঘিতে শিশুরা সাঁতার কাটে। তাদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ রয়েছে। যোগ্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা এখন বিকশিত হচ্ছে। তাদের মেধা বিকাশে অর্থের প্রতিবন্ধকতা নেই। ওড়িশার জাজপুর অঞ্চলের অঞ্জলি মুণ্ডা নামে মাত্র ১৫ বছরের বালিকা 'খেলো ইন্ডিয়া' জনজাতির জন্য আয়োজিত প্রতিযোগিতার শুরুর দিনেই তিনটি স্বর্ণপদক পেয়ে অন্য প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেছে।

জনজাতিদের মধ্যে স্বাভাবিক উৎসাহ রয়েছে তিরন্দাজি খেলায়। ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল জনজাতির মানুষ ব্রিটিশ শাসনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে 'সাঁওতালি হুল' লড়াই (হুলবিদ্রোহ) জাতীয় জীবনে অমরত্ব লাভ করেছে। ব্রিটিশ শক্তি বন্দুকযুদ্ধে তা দমন করলেও সেই লড়াইয়ে সাহসী সাঁওতাল যোদ্ধারা অমর হয়ে রয়েছেন, বিশেষত তিরন্দাজে।

ওড়িশার রাজ্যপাল থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডের উড়ি-মাড়িতে হুল লড়াইয়ের বীর যোদ্ধা সিধু-কানু, চাঁদ-ভৈরব এবং বীর দুই ভগিনী ফুলো- ঝানোদের মূর্তি উন্মোচন

অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল।

ভারতের প্রতিটি শিশু মহান তিরন্দাজ একলব্যের নাম শুনেছে। তিনি প্রতিটি ভারতীয় বিশেষত জনজাতিদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। বর্তমানে ক্রীড়ামেধা তৈরির জন্য 'একলব্য আবাসিক মডেল বিদ্যালয়' তৈরি হয়েছে মেধা বিকাশের লক্ষ্যে যাবতীয় আধুনিক ব্যবস্থা নিয়ে।

আমার নিজস্ব উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে আমাদের গ্রামেই অনগ্রসর শ্রেণীর বাচ্চাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়। আমার এই ছোট্ট প্রয়াসের মাধ্যমে ওই বিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে তিরন্দাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সরকারের সহায়তায় এবং সামগ্রিক সহযোগিতায় সেখানে গড়ে উঠেছে জনজাতি শিশুদের জন্য মেধা অন্বেষণ কেন্দ্র।

অন্যান্য জনজাতির শিশুদের মতো আমিও একজন ক্রীড়া অনুরাগী, বিশেষ করে সাঁতারে। আমি প্রায়শই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতাম। এরকম আরও একটি প্রতিযোগিতায় আমি সরে দাঁড়াই আমার এক বন্ধুকে প্রথম পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার জন্য।

খেলা দলগত সংহতি বাড়ায় এবং এই সংহতি সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। সাধারণত খেলোয়াড়রা মাঠে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে থাকলেও মাঠের বাইরে তারা বন্ধু।

আমার ভাই এক বড়ো মাপের ফুটবলার হওয়া সত্ত্বেও তিনি খেলাটি খেলতে পারেননি শারীরিক বড়ো আঘাতের কারণে। তবে আমাদের পরিবারের অনেকেই বিভিন্ন খেলাধুলায় পটু ছিলেন। আমি আমার পরিবারের কথা এই জন্যই বললাম যে আমাদের মতো জনজাতির অনেক পরিবারই ক্রীড়া জগতে তাদের সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অদম্য সাহস ও প্রেরণা, যা তাদের সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

যদি মেধাকে এমনভাবে প্রতিপালন করা যায় তাহলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে, প্রশিক্ষণের দ্বারা ক্রীড়া বিনোদনের বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের জন্য সামাজিক মেলবন্ধনের সুযোগ তৈরি করবে। এর মধ্যে দিয়ে জীবনে এগিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করবে, আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে এবং সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রচেষ্টায় 'খেলো ইন্ডিয়া' স্লোগানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলোকে ও কিছু ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ২০১৮ থেকে এ নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে।

এই কিছু দিন আগে পর্যন্ত ক্রীড়াক্ষেত্রে ভালো ভালো ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল। বড়ো শহরগুলোতে, যদিও গ্রাম ও বনাঞ্চলে লুকিয়ে রয়েছে বহু মেধা। স্পোর্টস অ্যাকাডেমি এতদিন জনজাতি অঞ্চলে ছিল না। এখন 'খেলো ইন্ডিয়া' এই সরকারি প্রয়াসের মাধ্যমে ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে শিশুদের ক্রীড়া বিকাশের জন্য।

আমার মনে পড়ে, আমার ছোটোবেলায় দেখতাম যে আশেপাশের পাঁচ-ছয়টি গ্রাম থেকে লোকজন আসত আমাদের গ্রামে এবং একত্রিত হতো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে। আধ্যাত্মিক জগতের ও সাংস্কৃতিক জগতের মানুষেরাও আসত ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রসার ঘটাতে এই সব জনজাতি অঞ্চলে। এমনকী এই গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় প্রায়ই অংশ নিতে দেখা যেত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের, কিন্তু এর মাধ্যমে এরা বেশি দূর এগোতে পারত না। সেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রয়াসের মাধ্যমে 'ট্রাইবাল গেমস-২০২৬' এই প্রক্রিয়ায় একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের জনজাতি ক্রীড়াবিদদের চিহ্নিত করে বিভিন্ন সুযোগ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে দেশজুড়ে। ভারত সেই ১৯২৮ সালে হকিতে প্রথম স্বর্ণপদক পেয়েছিল অলিম্পিক গেমসে এবং সেই জয়ে জনজাতিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তারপর থেকে পুরুষ ও মহিলা হকিতে হকি তারকারা যেমন দিলীপ তিরকে, সুবোধ লাকড়া, সালিমা টেটের মতো তারকারা, তাঁরা মেধা দিয়ে ভারতীয় হকি জগৎটাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অধীনে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রচারের মাধ্যমে দেশের সব ভৌগোলিক অঞ্চলের ক্রীড়া ইকোসিস্টেম তৈরি করে স্থানীয় স্তর থেকে একেবারে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত উন্নয়নে গতি বৃদ্ধির প্রয়াস চলছে। এই পরিকল্পনার অধীনে জনজাতি মহিলাদের ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য 'অস্মিতার উন্নয়ন' নামে একটি নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। 'খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস্-২০২৬' প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রগতির যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে ক্রীড়া জগতে ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করবে এবং এদের সাফল্য দেশকে, ক্রীড়া জগতে ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবে।

সাত লক্ষেরও বেশি ক্রীড়াবিদ বস্তার ও সারগুজা অলিম্পিকে সাম্প্রতিক সময়ে অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে অনেক যুবক মাওবাদী আন্দোলন থেকে সরে এসে ক্রীড়াকে বেছে নিয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। যুবকরা খেলার মাধ্যমে তাদের সব শক্তি ও উদ্দীপনা উজাড় করতে নেমে পড়েছে। সরকারও এদের মধ্যে থেকে খেলোয়াড় বেছে নিতে নেমে পড়েছে এবং এই নির্বাচিতরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যাতে ভালো ফল করতে পারে।

আমাদের যুবকদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা যাদের মধ্যে জনজাতির যুবকরাও অন্তর্ভুক্ত, তারা আমাদের জাতীয় জীবনে, এক সামাজিক সম্পদ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জাতির এই অমূল্য সম্পদ আমরা যদি সঠিকভাবে লালন পালন করতে পারি তো আমরা অচিরেই বড়ো সাফল্য অর্জন করব। তাই আমি আওয়াজ তুলে বার্তা দিতে চাই— 'খেলো ইন্ডিয়া, খুব খেলো ইন্ডিয়া!'

(লেখিকা ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি)

চন্দ্রনাথ হত্যা কি রাজ্যকে অশান্ত করার লক্ষ্যে বিদায়ী শাসক দলের নতুন কোনো ছক?

জাহ্নবী রায়

গত ৬ মে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যার নেপথ্যে কি অন্য কিছু লুকিয়ে আছে? নাকি নতুন কোনো ছক পরিবর্তনের শান্তির আবহাওয়াকে অশান্ত করে তোলার? নাকি কোনো অন্তর্নিহিত চক্রান্ত যা খুনের রাজনীতির জন্ম দেবে? নাকি এই হার মেনে না নেওয়ার জন্য বিদায়ী শাসক দলের কোনো প্রতিহিংসামূলক কাজ? অনেকেই মনে করছেন, এই রাজ্যের পট পরিবর্তনের অন্যতম যোদ্ধা শুভেন্দু অধিকারীকে এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করল তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যে তুমি নিজে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে পারো আমরা দেখব? এই প্রশ্নগুলি মানুষের মনের মধ্যে ঘুরছে সারা রাজ্যে, সারা দেশ জুড়ে।

এদিকে মধ্যমগ্রামের ওই বেসরকারি হাসপাতালে জমতে থাকা সাধারণ মানুষ থেকে বিজেপির সমর্থকদের মনে অনেক জিজ্ঞাসা উঁকি মারতে শুরু করেছে। যেখানে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে ভোট পরবর্তী সময়ে বিজেপির প্রথম একজন এভাবে নিজের জীবন দিলেন, সেখানে ছিল না কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা। যে গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিও বেওয়ারিশ। আপ্তসহায়ককে এভাবে পরিকল্পনা করে হত্যা কেন করা হলো। সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। যেমন খোঁজার চেষ্টা চলছে এই হত্যার নেপথ্যে কে আছে। এদিকে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, বিজেপি যখন রাজ্যের ক্ষমতায় আসছে, সেই সময়ে এই রাজ্যে একটা অশান্তির মোড়কে মুড়তে চাইছে বিদায়ী শাসক দল। তারা যেনতেন প্রকারেণ একটি অশান্ত পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে প্রথম থেকেই, যেখানে শুরু থেকেই বিব্রত থাকতে হবে বিজেপির সমস্ত টীমকে। এদিকে এই আশঙ্কার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী। বিভিন্ন এলাকায় চলছে অশান্তি তৈরির একটা উদ্যোগ। বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা এসেছে। বিদায়ী শাসক দলের দিকে অভিযোগ তুলছেন যে এলাকায় অশান্তি হচ্ছে, সেই এলাকার মানুষজন। তাঁরা বলছেন, এই অশান্তি তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে মানুষজন বলছেন, যারা করছে, তারা সবাই কিন্তু একসময়ে শাসক দলের জামা পরে থাকত। এখন অন্য জামা গায়ে চাপিয়ে তুমুল অশান্তি করছে। তথাকথিত সংখ্যালঘু এলাকাকে টার্গেট করে ভাঙচুর করা হচ্ছে, ভাঙা হচ্ছে দোকানপাট, দখল করা হচ্ছে তৃণমূলের পার্টি অফিস। ভয় দেখানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে একেবারে সারা রাজ্য জুড়ে একটা অশান্ত করে দেবার চক্রান্ত শুরু করেছে রাজ্যের বিদায়ী শাসক দল।

একটাই উদ্দেশ্য, রাজ্যকে অশান্ত করে, নতুন এই সরকারের প্রতি মানুষের যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মায়। দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে এই কথা যাতে বলা যায়, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। সংসদে যাতে রাজ্যের তৃণমূল সাংসদরা রাজ্যের অরাজক অবস্থা নিয়ে চিৎকার করতে পারে। অন্যদিকে এই অরাজক পরিস্থিতি তৈরির মাধ্যমে এই রাজ্যে শিল্পোদ্যোগী আসতে যাতে ভয় পায়। রাজ্যের সাধারণ মানুষ যাতে ভয়ে বাড়ির বাইরে যেতে ভয় পায়, সেই পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বিদায়ী শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। শুরু থেকেই এই পরিবেশ তৈরির একটাই কারণ ক্ষমতা হারিয়ে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠেছে শাসকদলের মাথারা। একদিকে রাজ্যের বিদায়ী শাসক দল মেনে নিতে পারছে না এই পরাজয়। অন্য দিকে মেনে নিতে পারছে না নানা উপায়ে যে টাকার স্রোত বইত, সেই স্রোত এক ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই না মেনে নেওয়ার একটাই কারণ সিন্ডিকেট রাজকে একেবারে থামিয়ে দেওয়া। যারা এই তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সিন্ডিকেট চালাত, তারাই প্রকারান্তরে হয়ে উঠেছে এই অশান্তি তৈরির চালিকা শক্তি, সেটিও বলছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটি বড়ো অংশ। ফলে আগামী কয়েক মাস যে রাজ্যে এই অশান্তি তৈরির একটা চেষ্টা চলবে সেটা বলছে রাজনৈতিক মহলের একটি বৃহৎ অংশ। □

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন
এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মহাকাব্য

পুলক নারায়ণ ধর

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই নির্বাচন কেবলমাত্র সরকার পরিবর্তনের ঘটনা নয়— এটি ছিল এক যুগসন্ধিক্ষণ, এক সামাজিক ও মানসিক নবজাগরণের সূচনা। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে রাজনৈতিক হিংসা, ভয়, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও তোষণের যে অন্ধকার বাংলার আকাশ ঢেকে রেখেছিল, ২০২৬ সালের জনাদেশ সেই অন্ধকার ভেদ করে নতুন সূর্যোদয় ঘটায়।

২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল, ২০২৬— এই দুই দফার ভোটগ্রহণ শেষে ৪ মে ফলাফল ঘোষণার দিন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্যক্ষ করল এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ভূমিকম্প। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ৮০টি আসনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, আর ভারতীয় জনতা পার্টি ২০৭টি আসনে বিজয় অর্জন করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই ফলাফল ছিল কেবলমাত্র ভোটের পরিসংখ্যান নয়; এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি মানুষের দীর্ঘদিনের জমে থাকা বেদনা, ক্ষোভ ও আত্মমর্যাদাবোধের বিস্ফোরণ।

এই বিজয়ের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মত্যাগ, স্বামী বিবেকানন্দের আত্মগৌরবের বাণী এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এর অগ্নিসঙ্গীত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেন আবার স্মরণ করল— এই মাটি কাপুরুষদের নয়, এই মাটি চিরকালই বিপ্লব, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় চেতনার জন্মভূমি।

গত ৫০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন বহুবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। কংগ্রেস আমলের অন্তিম পর্ব থেকে শুরু করে ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং পরবর্তী ১৫ বছরের তৃণমূল জমানায় 'সায়েন্টিফিক রিগিং', রাজনৈতিক হত্যা, বিরোধীদের ঘরছাড়া করা এবং নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা যেন এরাজ্যের এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতায় পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারাতে বসেছিল যে ভোট দিয়েও পরিবর্তন সম্ভব।

কিন্তু ২০২৬ সালে সেই বিশ্বাস পুনর্জন্ম লাভ করে। ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর ও নিরপেক্ষ ভূমিকার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে প্রথমবার গ্রাম থেকে শহর— সর্বত্র সাধারণ মানুষ ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিতে সক্ষম হয়। বহু জায়গায় স্থানীয় দুষ্কৃতী ও বাহুবলীদের নিষ্ক্রিয় করা হয়। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, সন্ত্রাস— সবকিছুর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক দৃঢ়তা সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনে। এই নির্বাচন তাই বহু বিশ্লেষকের চোখে এক 'রক্তপাতহীন গণঅভ্যুত্থান' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের ভোটে, সাহসে ও আত্মমর্যাদাবোধে। পশ্চিমবঙ্গের মাটি আবার যেন উচ্চারণ করছে— 'যে মাটিতে জন্ম নিয়েছে ক্ষুদিরাম, নেতাজী, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ, সেই মাটি কখনও অন্যায় ও অধর্মের কাছে মাথা নত করে না।'

২০২৬-এর নির্বাচনে হিন্দু সমাজের অভূতপূর্ব ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। বহু সাধারণ মানুষের মতে, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক কিছু মন্তব্য ও রাজনৈতিক অবস্থান হিন্দু সমাজের মধ্যে গভীর নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি করেছিল। জাতি, বর্ণ, ভাষা এবং আর্থিক বিভাজন ভুলে বহু মানুষ নিজেদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় রক্ষার প্রশ্নে একত্রিত হয়। এই ঐক্যই ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয়ের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে।

'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বহু মানুষের কাছে এটি কেবল একটি ধর্মীয় উচ্চারণ নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বাধা, উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক বিতর্ক এবং ভক্তদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনাগুলি জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। রাজ্যের মানুষ শেষপর্যন্ত সেই প্রতিক্রিয়ার জবাব দেয় ব্যালট বাক্সে।

তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন 'বাঙ্গালি আবেগ'কে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল এবং বিজেপিকে 'বহিরাগত' হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে সেই কৌশল কার্যত ব্যর্থ হয়। রাজ্যের মানুষ উপলব্ধি

ফঃ ২

করতে শুরু করে যে বাঙ্গালিত্ব ও ভারতীয় জাতীয়তা একে অপরের পরিপূরক। ঋষি অরবিন্দের আধ্যাত্মিকতা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার বাণী, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমি বন্দনা এবং নেতাজীর অগ্নিসংগ্রাম— সবই ভারতীয় চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার রাজনীতি তাই মানুষের হৃদয়ে আর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

এই বিজয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের তীব্র ক্ষোভ। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন কেলেঙ্কারি, 'কাটমানি' ব্যবস্থা এবং একের পর এক তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তারি সাধারণ মানুষের মনে শাসকদলের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা তৈরি করেছিল। চাকরিপ্রার্থীদের অশ্রু, বেকার যুবকদের হতাশা এবং সাধারণ মানুষের বঞ্চনা এই নির্বাচনে এক বিশাল রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

আরজি কর হাসপাতালে অভয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘৃণা ও বিক্ষোভ সে সময়কার সরকারের বিরুদ্ধে যে তীব্রতার সৃষ্টি করেছিল তার ধাক্কা এসে পড়েছে এই নির্বাচনে। মানুষ ব্যালটের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাঁদের মেয়েকে তাঁরা ভোলেনি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তারা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছে।

সন্দেশখালি কাণ্ডও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল— ক্ষমতার ছত্রছায়ায় সাধারণ নারী ও গ্রামবাসীদের উপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই ঘটনাগুলি পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেদের মনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। ২০২৬-এর নির্বাচন তাই বহু নারীর কাছে ছিল মর্যাদা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে এক নীরব প্রতিবাদ।

বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের কাছেও এই নির্বাচন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) তাঁদের কাছে কেবল একটি আইন নয়, বরং আত্মমর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। মতুয়া সমাজ-সহ বিভিন্ন উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, তাঁদের বহুদিনের নাগরিকত্বের দাবি পূরণে বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও মানুষ পরিবর্তন চাইছিল। গত ১৫ বছরে বড়ো শিল্পের অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট এবং শিক্ষিত যুবকদের অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য হওয়া পশ্চিমবঙ্গের সমাজে গভীর হতাশা সৃষ্টি করেছিল। বহু পরিবার ভেঙে গিয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক জীবনের কষ্টে। বিজেপির 'সোনার বাঙ্গলা" এবং 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'-এর প্রতিশ্রুতি তাই উন্নয়নকামী মানুষের কাছে নতুন আশার আলো হয়ে ওঠে।

২০২৬ সালের নির্বাচনের এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল ভোটার তালিকার স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর)। বহু বছর ধরে অভিযোগ ছিল যে ভোটার তালিকায় ভুয়া নাম, মৃত ব্যক্তি এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উপস্থিতি নির্বাচনী স্বচ্ছতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল। এই সংশোধনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার ফলে নির্বাচনকে আরও নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ করার দাবি সামনে আসে। বিজেপি এই প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্রের শুদ্ধীকরণ হিসেবে তুলে ধরে, আর বিরোধীরা এর সমালোচনা করে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি নির্বাচনের অন্যতম বড়ো রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হয়েছিল।

এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এক নতুন আবেগের জন্ম হয়। বহু মানুষের চোখে জল, মুখে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'ভারতমাতা কী জয়'-এর ধ্বনি যেন এক নতুন আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। মানুষ অনুভব করতে শুরু করে যে দীর্ঘ অন্ধকারের পর এরাজ্যের আকাশে নতুন ভোরের আলো ফুটেছে।

২০২৬-এর নির্বাচন তাই শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পালাবদল নয়; এটি ছিল আত্মপরিচয়ের সন্ধান, সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই জনাদেশ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অন্যায়, দুর্নীতি ও ভয়কে চিরকাল মেনে নেয় না। এই পরিবর্তনের অন্য আরেকটি দিক ও আছে যা উপেক্ষা করা যায় না। যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার জেহাদি শক্তিকে পশ্চিমবঙ্গে জাগিয়ে তুলছিল এবং বাংলাদেশের জেহাদিদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল তা হিন্দু বাঙ্গালির কাছে একটি ভয়ংকর অশনি সংকেত ছিল। ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা এবং তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির ছবিই তাদের স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছিল। ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন তাই হিন্দু বাঙ্গালির কাছে আত্মরক্ষা এবং দেশ রক্ষার প্রতিজ্ঞা ছিল। এই নির্বাচন ছিল বাঙ্গালি অস্মিতা শুধু নয়, হিন্দু অস্মিতারও প্রসঙ্গ। এই নির্বাচন ছিল তাদের কাছে একটি plebiscite বা গণভোট। দলমত নির্বিশেষে হিন্দু বাঙ্গালির ভোট বিপুলভাবে বিজেপি দলের পক্ষে পড়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই বঙ্গের আত্মা আহত হয়েছে, তখনই এই মাটি নতুন বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন দিগন্তের সামনে দাঁড়িয়ে। সামনে রয়েছে বহু চ্যালেঞ্জ, বহু প্রত্যাশা। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে এই বিশ্বাস পুনর্জাগ্রত করেছে যে, গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের ভোটে, সাহসে ও আত্মমর্যাদাবোধে। পশ্চিমবঙ্গের মাটি আবার যেন উচ্চারণ করছে— 'যে মাটিতে জন্ম নিয়েছে ক্ষুদিরাম, নেতাজী, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ, সেই মাটি কখনও অন্যায় ও অধর্মের কাছে মাথা নত করে না।' □

আগামী পঞ্চাশ বছর হোক বাঙ্গালির নয়া অভ্যুদয়-যুগ

যে বুদ্ধিজীবীরা বিদেশি আদর্শ মাথায় নিয়ে শুধু নিজেদের সৌভাগ্য সৃষ্টিতে ব্যস্ত থেকে সাধারণ বাঙ্গালির ভাগ্যকে বিগত অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার লাঞ্ছিত হতে দিয়েছেন, সেইসব 'বুদ্ধিজীবী হইতে সাবধান' হলেই নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার রাস্তা প্রশস্ত হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করি।

জ্যোতির্ময় গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনকে যদি বৃহত্তর ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, তাহলে আমাদের মন অবশ্যই দেখতে চাইবে, একটি দলের হাত থেকে অন্য দলের হাতে নিছক ক্ষমতার এক পালাবদল নয়। মন দেখতে চায়, এক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচনা। গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ পশ্চিমবঙ্গকে চালিত করেছে, তার মূল সুরটি ছিল বিরোধ, প্রতিরোধ ও সংঘাত। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম সত্য হলো, সংঘাত সমাজকে সচল রাখলেও, তাকে উন্নত করে না। সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন সৃষ্টি, সমন্বয় ও প্রসার।

বামপন্থী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে একসময় কংগ্রেসের শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছিল। তাদের কথা ছিল শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং নীচুতলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা 'বিরোধিতার রাজনীতি'-তে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গলের তুলনায় সব স্তরের ক্ষুদ্র এক নেতা-গোষ্ঠীর স্বার্থচিন্তাতেই তার প্রচেষ্টা সংকুচিত হয়ে আসে। এই সত্যকে আড়াল করতে নিত্য নানা লড়াই-লড়াই-লড়াইয়ের আমদানি করতে হয়। দেখা যায়, নিত্য লড়াই লেগে গেছে— শিল্প বনাম শ্রম,গ্রাম বনাম শহর, দল বনাম সমাজ, ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি। এই ধারাবাহিক সংঘাতের রাজনীতি সমাজে এতদিন শক্তির অপচয় ঘটিয়েছে প্রায় বিনা বাধায়। সৃষ্টি যেখানে নতুন সম্পদ, নতুন সুযোগ এবং নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে, সেখানে সংঘাত প্রায়শই বিদ্যমান সম্পদের বণ্টনকে নিয়েই টানাপোড়েন সৃষ্টি করে। ফলে উৎপাদনের বিস্তার না ঘটিয়ে বণ্টনের রাজনীতি প্রাধান্য পায়। উৎপাদনের তালে-তালেই বণ্টনের অমিত সম্ভাবনার কথা অগোচরে লুকিয়ে থাকে তখন। মানুষকে ভাতা-ভিক্ষায় ভুলিয়ে রাখার উৎকট প্রয়োজনও তখন অত্যন্ত বেড়ে যায়। একজনের থেকে কেড়ে অন্যজনের হাতে দেওয়ার বাইরে আয়-উৎপাদন ও দেওয়া-নেওয়ার বিচিত্র শ্রীছন্দের প্রতিষ্ঠা তখন অগোচরে হারিয়ে থাকে। এই কারণে শুধু এক-দেড় দশকই নয়, গত পাঁচ-ছয় দশকই পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি গুরুতর 'অপচয়ের যুগ' বা অন্তত 'অসম্পূর্ণ সম্ভাবনার যুগ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পদ-সৃষ্টির বৃহদায়িত ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের অসহায় আর্তনাদ দূর করতে চেয়ে তাকে বাড়িয়ে তোলার উদ্ভট গুরু দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে বামপন্থী দলগুলি। তাই 'বাঙ্গালি' বলতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দিন মজুর বোঝাতে শুরু করেছে আজ তিন-চার দশকই।

বাঙ্গালির এই দুর্গতির অপরিহার্য ফল হলো, আত্মদম্ভজনিত দুর্মতি। এই কারণে গৌরবের পথ চলা ভুলে বাঙ্গালি বৃথা অহঙ্কার করতে বসে। তখন অন্ধ অহঙ্কার অবাধে অনুপ্রবেশ করে বাঙ্গালি অস্মিতার বেয়াড়া শুভনাম নিয়ে। বাঙ্গালি এগিয়ে চলা ছেড়ে বৃথা আত্মকণ্ডুয়নেই কালাতিপাত করা সমীচীন মনে করে। যে-আত্ম সম্প্রসারণকে স্বামী বিবেকানন্দ 'জীবন' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তার বিপরীত আত্মসংকোচনই তার বেদনাদায়ক পরিণাম হয়ে ওঠে।

বঙ্গভূমির ইতিহাস কিন্তু একেবারেই ভিন্ন কথা বলে। যখনই বাঙ্গালি বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে, তখনই তার উত্থান ঘটেছে। শশাঙ্ক যুগ,পাল যুগ, চৈতন্য যুগ ও ইংরেজ শাসন— সব যুগেই সর্বভারতীয়তার জ্ঞান, শিক্ষা ও সংযোগের বিস্তার বাঙ্গালির অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ হয়েছে। এই প্রতিটি পর্বে একটি সাধারণ সূত্র কাজ করেছে— বৃহত্তর ভারত এবং বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ (Integration), বিচ্ছিন্নতা (Isolation) নয়।

বিশেষ করে উনিশ শতকে, ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালি শুধু নিজের ঐতিহ্যকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেনি, সেইসঙ্গে ইংরেজি গ্রিক-রোমান তথা ইউরোপীয় চিন্তার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে। ফলে একসঙ্গে 'ভারতযোগ' ও 'বিশ্বযোগ'— এই দুইয়ের সমন্বয়ে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সম্ভব হয়েছিল বাঙ্গালির।

বিগত পাঁচ/ছয় দশকের পতন যুগের অবসানে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তনকে একটি অনন্য সুযোগ হিসেবে দেখা ছাড়া বাঁচতে চাওয়া বাঙ্গালির আর গত্যন্তর নেই। এটি কেবল একটি দলের জয় নয়, বরং একটি মানসিকতার পরিবর্তনের ইঙ্গিত; মানুষ এখন দিশাহীন সংঘাতের বদলে একটা ফল দেখতে চায়, চায় নিরন্তর সরকার-নির্ভরতার বদলে আত্মনির্ভরতা এবং বিচ্ছিন্নতার বদলে সংযোগ। বস্তুত সম্প্রীতি-আশ্রিত যোগের দ্বারাই বাঙ্গালির পুনর্জাগরণ সম্ভব। এই যোগের নানা স্তর। সন্নিহিত সমাজ-যোগ, বিস্তারিত ভারত-যোগ ও বহুবলয়িত বিশ্ব-যোগ। এক সৃষ্টিমুখী সমাজসংগঠনের দ্বারা এই বহু-স্তরান্বিত যোগ-সাধনাই হবে বাঙ্গালির আগামী পঞ্চাশ

বছরের মূল দর্শন। তার সবচেয়ে বড়ো কাজ হবে-– সংঘাতের শক্তিকে সৃষ্টির শক্তিতে রূপান্তরিত করা।

কিন্তু কী করে শুরু হতে পারে অভ্যুদয়ের পথে আবার চলা?

(১) বুথ থেকে শুরু করে গ্রাম, গ্রাম-পঞ্চায়েত, ব্লক বা এক একটা নির্বাচনী ক্ষেত্র ধরে ক্রমিক নিম্নস্তর-উদ্ভূত কৃষি ও কৃষিশিল্প-আশ্রিত স্বরোজগার-সৃষ্টির নানামুখী উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ রচনাই হবে আগামী সরকারের গ্রামীণ উন্নয়নের প্রধান প্রচেষ্টা। বলা ভালো— 'শূন্য বর্জ্য, শূন্য বেকারত্ব মিশন' নিয়ে কাজ করার। এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে জান্তব জবরদস্তি-নির্ভর পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সবার আগে আশু প্রয়োজন। যে-বিন্যাসের মূলে থাকবে ফিরিয়ে-নেওয়ার নিয়ম-সহ নির্দলীয় নির্বাচন-ব্যবস্থা। ভারতীয় সমাজ-সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হবে যার অন্যতম লক্ষ্য। যার মধ্যে দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে মূল্যবোধ-চর্চার প্রশস্ত পরিসর। যে-মূল্যবোধ হয়ে উঠবে গ্রামীণ উদ্যোগ-সৃষ্টির অপার সম্ভাবনাময় অমূল্য মূলধন। সেই মূলধন-মূল্যের অসীম সম্ভাবনার অল্প অল্প আন্দাজ দেওয়াসহ সব সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে গ্রামীণ উদ্যোগের বিচিত্র হদিশ দেওয়াই হবে আগামীদিনের স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়েরও পাঠ্যসূচির অন্যতম অঙ্গ।

(২) ভারতযোগকে শক্তিশালী করা হবে দ্বিতীয় প্রধান করণীয়। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্জাগরণের অন্যতম চাবিকাঠি হবে ভারতের বৃহত্তর অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও জ্ঞানব্যবস্থার সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ও শিল্প সংযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময়, জাতীয় স্তরে দক্ষতা ও শিক্ষার বৈচিত্র্যসহ ঐক্যসাধন হবে যার অন্যতম সুফল। বস্তুত, প্রথম করণীয় প্রসঙ্গে সব সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের যে সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে, তার তূরীয়সম্ভাবনার উদ্ঘাটনের জন্যই চাই ভারতীয় সংস্কৃতি-আশ্রিত সমাজদর্শনের একান্ত চর্চা। যেখানে সকলের সুখের কথা, দুঃখভাগী কাউকে না হতে দেওয়ার আদর্শ পরম সংবেদনশীলতার সঙ্গেই বাস্তবায়িত হতে পারে। তৃণমূল পর্যায়ে ভারত-আত্মার এই শক্তিকে বিকাশের জায়গা করে দিতে পারলে সারা বিশ্ব তার শ্রী ও শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যের মতো হাজির হবে তা দেখতে ও শিখতে। যাকে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি বলে তা-ই তখন এমনি-এমনি জেগে উঠবে বিপুল হারে, বাঙ্গালি যদি বিদেশকে নকল করে নয়, আপন মহিমাতে আপনিই জেগে উঠতে পারে আবারও।

(৩) বিশ্বযোগের সম্প্রসারণও চাই। শুধু ভারত নয়, বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্ঞানব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত হতে হবে। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে অংশগ্রহণ,আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ, বৈশ্বিক শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ— সবই খুব জরুরি। সেইসঙ্গে তিনটি মৌলিক চ্যালেঞ্জকে (Environment– Employment– Agriculture)--- পরিবেশ, নিযুক্তি ও খাদ্যনিরাপত্তার সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হবে। এই বৃহত্তর চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে তিনটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে কাজ করতে হবে। পরিবেশ-বান্ধব কৃষি, স্থায়ী উন্নয়ন ছাড়া রক্ষা পেতে পারে না। এ ব্যাপারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেও ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে, অবশ্যই প্রয়োজনীয় সতর্কতা-সহ।

চাকরির পাশাপাশি স্বনিযুক্তির বিস্তার করতে হলে কৃষি ও খাদ্য সুরক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ ঘটাতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর ও বাজার এবং সমাজ-সংযুক্ত কৃষিব্যবস্থা স্থাপিত হলেই তবে গ্রামীণ সব সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে। উন্নয়নের বাস্তব মন্ত্র হতে হবে ইতিমধ্যেই যে যে সম্পদ আছে তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার। সম্পদ মানে— Land-Hand-Fund, সবই। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হতে পারে— সব জমি সব জলের সদ্ব্যবহার। চাষের জমিতে প্রাকৃতিক চাষের প্রচলন করতে পারলেই উদ্যানকৃষি ছাড়াও রাজ্যের অন্তত চার ভাগের এক ভাগ ধানচাষের জমিতেই স্বল্পকালীন মাছচাষের ব্যবস্থাও করা যায়। যার ফলে সংলগ্ন এলাকার মানুষের খাদ্যে প্রভূত প্রোটিনের বন্দোবস্ত করা ছাড়াও মৎস্য উৎপাদনে বান ডাকানো যায়। সব জমি, সব জল, সব হাতের সদ্ব্যবহারের এক বিপুল সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলবে যা।

সব ফান্ড বলতে ভাতা-ভিক্ষারূপে ছেটানো বিক্ষিপ্ত অর্থের অন্তত একাংশের, ধরা যেতে পারে, ঘোষণাকৃত বর্ধিত একাংশের সূচনায় ব্যবহারও প্রভূত সুফলবাহী হবে। সমস্ত কাজকে উত্তরোত্তর অধিকতর পুঁজিনির্ভর করে-তোলার চেয়ে সুষ্ঠুতর সম্পর্কনির্ভর করে তোলার দিকে বেশি নজর দেওয়া চাই। অপেক্ষাকৃত কম পুঁজিতে বেশি আয়ের এক নতুন সংস্কৃতির সূচনা হবে তাতে। অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন প্রকল্পগুলিকে সমন্বিত করতে পারলেই সেই বিচ্ছিন্ন উদ্যোগগুলো এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হবে।

গত কয়েক দশকের একটি বড়ো সমস্যা ছিল বিচ্ছিন্নতা। নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতা। তার মধ্যে অন্যতম হলো, ভারত নামক দেশের সঙ্গে লাগাতার এক ছায়াযুদ্ধে বাঙ্গালিকে অযথা জড়িয়ে রেখে বামপন্থী ও সুপার বামপন্থীরা বাঙালির পতন-যুগেরই পোষকতা করেছেন— জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানতভাবে। আগামীদিনের লক্ষ্য হওয়া উচিত— কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার মধ্যে সমন্বয়। শহর ও গ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধন, সরকার ও সমাজের মধ্যে সহযোগিতা। বস্তুত, বাস্তব ক্ষেত্রে, প্রত্যাশিত সমন্বয়ের এই দিগন্তকে না দেখতে পাওয়ার দ্বারাই পশ্চিমবঙ্গে এতকাল উদারতার নামাবলী গায়ে বিভাজনের রাজনীতি প্রশ্রয় ও প্রতিপালন পেয়েছে। সব আমরা-তোমরা, সব বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির নতুন সংস্কৃতিই হবে যাবতীয় আপজাত্যের সেরা প্রত্যুত্তর।

'তথাকথিত বুদ্ধিজীবী' হতে সাবধান : বঙ্গে ইতিহাস আমাদের শেখায়— বাঙ্গালি কখনোই স্থায়ীভাবে পিছিয়ে থাকার জাতি নয়। সে যেমন দ্রুত উত্থান ঘটাতে পারে, তেমনই ভুল পথে গেলে দ্রুত পতনও ঘটে। গত পঞ্চাশ বছর যদি বিদেশি আদর্শের অনুসরণে সংঘাতের আধিক্যে আত্ম-অপচয়ের বা অপূর্ণ সম্ভাবনার যুগ হয়ে থাকে, তাহলে আগামী পঞ্চাশ বছর হতে পারে সৃষ্টির যুগ; যদি আমরা বৃহত্তর ভারত ও বিশ্বের সঙ্গে নিজেদের গভীরভাবে যুক্ত করতে পারি, এবং সংঘাতের শক্তিকে সৃষ্টির শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি ; ভারতীয় আদর্শেই। ছয় কোটি সাধারণ গ্রামবাসী বাঙ্গালির ভাগ্যকে পুনর্রচনার দ্বারাই সূচিত হতে পারে গ্রামে-শহরে, সমাজে, ধর্মে-ধর্মে, বর্ণে-বর্ণে, উঁচুতে-নিচুতে ; সব আমরা-তোমরার মধ্যে সম্পর্কের এক অমৃতময় সঞ্জীবনী। যে বুদ্ধিজীবীরা বিদেশি আদর্শ মাথায় নিয়ে শুধু নিজেদের সৌভাগ্য সৃষ্টিতে ব্যস্ত থেকে সাধারণ বাঙ্গালির ভাগ্যকে বিগত অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার লাঞ্ছিত হতে দিয়েছেন, সেইসব বুদ্ধিজীবী হইতে সাবধান' হলেই নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার রাস্তা প্রশস্ত হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করি। □

ভোট : ২০২৬

ভেঙেছ দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময় তোমারই হউক জয়

সুজিত রায়

সোমবার ৪ মে, ২০২৬। বারবেলা তখন কেটে গেছে। কিন্তু আবহাওয়াটা তেমন সুবিধাজনক নয়। মনে হচ্ছে সন্ধ্যে হতে না হতেই কেমন এক ধূসর ধুলোর স্তর পশ্চিমবঙ্গের আকাশে। রাত গভীর হতে তখনও ঢের দেরি। আচমকাই একটা আওয়াজ 'ধপাস'। দক্ষিণ কলকাতার শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের আশেপাশে সেদিন যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই শুনতে পেলেন। বুঝতে পারলেন— মহীরুহের পতনের শব্দ নয়। যেন কেউ শ্যাওলায় পা দিতেই পিছলে পড়েছে 'ধপাস' করে। আরও ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে উঠল স্লোগান— 'জয় শ্রীরাম', 'বন্দে মাতরম্', 'বিজেপি জিন্দাবাদ', 'ভারতমাতা কী জয়।' স্পষ্ট হলো— ৮২৩ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বের পুনঃস্থাপনা হলো। এবার অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ জুড়ে শুরু হবে মানব উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। সেই কর্মযজ্ঞের মূল লক্ষ্য, আরও বৃহত্তর পরিধি ঘিরে মানব উন্নয়ন। বিপথগামী রাজনীতির ফাঁদে বন্দি সমাজকে শৃঙ্খলমুক্ত করা। গোটা সমাজকে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী সনাতনী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক করে তোলার কাজ।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দ। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের অন্যতম অঙ্গ বঙ্গের হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন যখন দাপটের সঙ্গে রাজ্য শাসন করছেন, তখনই কালান্তক যমের মতো আচমকাই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির নৃশংস আক্রমণ। কুতুব-উদ্দিন আইবকের সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি সেন বংশের বিলুপ্তি ঘটিয়ে বঙ্গে বাহুবলের জোরে প্রতিষ্ঠা করেছিল খিলজি শাসন। তারপর ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত চলেছে মুসলমান শাসনের ধারাবাহিকতা। এমনকী ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি মেলার প্রাক-মুহূর্তেও রাজনৈতিক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ছিল বঙ্গে মুসলিম লিগের শাসন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো ১৯৪৭ সালে। কিন্তু পোড়াকপাল বঙ্গের তথা গোটা ভারতবর্ষের। ধর্মনিরপেক্ষতার বোরখা পরে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি যখন যেখানে যে শাসক দল ক্ষমতার আসনে বসেছে, তারাই পর্দার আড়ালে খেলেছে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের তুরুপের তাস। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, কারণ বঙ্গ ভাগ হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে। কিন্তু সরকারিভাবে সে ভাগ হলেও, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পূর্ণভাবে রাহুমুক্ত হতে পারেনি। বিশেষ করে মুসলমানরা থেকে গিয়েছিলেন এপার পশ্চিমবঙ্গেই। ওই মুসলমানদের তাতে কোনো সুবিধা হয়নি কিন্তু সুবিধা লুটেছে রাজনৈতিক দলগুলি গত ৭৯ বছর ধরে। মুসলমান জনসংখ্যাকে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে কখনো কংগ্রেস, কখনো যুক্তফ্রন্ট, কখনো বামফ্রন্ট এবং সর্বশেষ তৃণমূল কংগ্রেস আক্ষরিক অর্থেই আঞ্চলিক দল হয়েও ক্ষমতা দখল করেছে। বঙ্গের সনাতনী ঐতিহ্য ক্রমাগতভাবে পিছু হটেছে যেমন, তেমনি শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুত্বের ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করে এক বিধর্মী রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে সেই প্রচেষ্টার শিকড়ে আঘাত হেনেছে পশ্চিমবঙ্গের জনতা। জনতা জনার্দন ৯৩ শতাংশ ভোটদান করতে পেরে বাধাহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি। দু' দফার ভোটে গোটা পশ্চিমবঙ্গ এই প্রথম গৈরিক রঙে রঙিন হলো। সেই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হলো পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় স্বাধীনতা। কারণ ধর্মের মুক্তি ছাড়া এতদিন প্রাপ্ত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। ২০২৬-এর নির্বাচন সেই স্বাধীনতাকে পূর্ণতা এনে দিয়েছে।

এত ভোট! ৯৩ শতাংশ!

পশ্চিমবঙ্গ এবার নির্বাচনী রাজনীতিতে একটা বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেছে। তা হলো সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে ভোটদানের পরিমাণ। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী ৯২.৯৩ শতাংশ। এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড। ভারতে তো বটেই। হয়তো-বা গোটা বিশ্বেও। কারণ গোটা ভারতেই দেখা গেছে সেই ১৯৫১ সাল থেকে গড় ভোটদান ৭০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এবার হঠাৎ কোন ম্যাজিকে ভোট শতাংশ বেড়ে গেল ২০ শতাংশেরও বেশি?

এ প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের পনেরো বছরের ইতিহাস, যে ইতিহাসকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণ্য কালো পৃষ্ঠা হিসেবেই চিহ্নিত করা শ্রেয়। কেন এই অভিযোগ? তাহলে তিল তিল করে খুঁজে বার করতে হবে গত পনেরো বছরে তৃণমূলি সার্কাসে পশ্চিমবঙ্গ কী কী হারিয়েছে এবং তার তালিকা তৈরি করা। সেই তালিকা তৈরির আগে আমরা দু'পা পিছিয়ে যাই— সেই পনেরো বছরের আগের চৌত্রিশ বছরের শাসনকালে যখন শাসক দল ছিল চোদ্দটি বামদলের একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট— বামফ্রন্ট। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭৭ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে তথা দলকে হারিয়ে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কংগ্রেস সরকার ১৯৭২ সালে মানুষের ভোটে জেতেনি। জিতেছিল ছাপ্পা ভোটে। মানুষের তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ আছড়ে পড়েছিল ভোটের বাক্সে ১৯৭৭ সালে। কিন্তু সেবারও সামগ্রিকভাবে ভোটদানের শতাংশ ছিল মাত্র ৫৬.১৫ শতাংশ। এর মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছিল পঁয়তাল্লিশ শতাংশেরও বেশি ভোট। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ফ্রন্ট একাই ২৩০টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গড়েছিল। পরবর্তী চৌত্রিশ বছরের শাসনকালে কংগ্রেস আর কখনো ফণা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস পেরেছিল।

এককালের কংগ্রেস সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস ১৯৯৮ সালে। কংগ্রেসের দুর্বলতার সুযোগে তৃণমূল কংগ্রেস প্রাথমিক পর্যায়ে বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্তত বিধানসভায় হাজিরা দেবার মতো কিছু বিধায়ককে পাঠাতে পেরেছিল। কিন্তু পূর্ণশক্তি অর্জন করতে এই আঞ্চলিক দলটির দীর্ঘ সময় কেটে যায়। ২০১১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট শাসনে ক্ষুব্ধ মানুষের ভোটদানের শতাংশ ছিল চুরাশি শতাংশের কিছু বেশি। মানুষের ক্ষোভকে হাতিয়ার করে এবং বামবিরোধী সিঙ্গুর আন্দোলন এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে গণআন্দোলন বলে প্রচার করে নির্বাচনে ১৮৪ আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে একদা রাইটার্স বিল্ডিঙের করিডোর থেকে চ্যাংদোলা করে রাজপথে নামিয়ে দিয়েছিল পুলিশ। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দখল করলেন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার। এই পর্যন্ত নির্বাচনী ফলাফলকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে— মানুষ শাসকদলের দুর্নীতি এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে। এরপর ২০১৬, ২০২১-দুটি নির্বাচনে লোকসভা থেকেও বিলুপ্ত হয়ে যায় বামশক্তি। কিন্তু ভোটের হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়ে যায়। জনপ্রিয়তা যতটা বাড়ে, দলীয় দুর্নীতির অভিযোগও ততটা বাড়তে থাকে। সেই অভিযোগগুলি শুধুমাত্র অভিযোগই নয়, এমনকী রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে উঠে আসা অভিযোগগুলির চেয়ে তীব্র ক্ষোভ হয়ে আছড়ে পড়ে সব হারানোর যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণা এক মায়ের সন্তান হারানোর যন্ত্রণার চেয়ে কম নয়। কী সেই যন্ত্রণা? আসুন তালিকাটা তৈরি করে ফেলি।

যন্ত্রণার তালিকা

বিজেপির প্রবীণ নেতা তথাগত রায় কথায় কথায় বলেন— মমতা ব্যানার্জি বামফ্রন্ট রাজনীতি অনুকরণের এক সেরা ছাত্রী। আমি বলব— তার চেয়েও বেশি। তিনি বাম জমানার পাপের যে দীর্ঘ তালিকা অনুসরণ করে তাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়েছেন তা আক্ষরিক অর্থেই একজন লুটেরা প্রশাসকের সমপর্যায়ভুক্ত। বামফ্রন্ট তার চৌত্রিশ বছরের প্রশাসনিক অবস্থানের মধ্যে ছাপ্পা ভোটের যে নিপুণ শিল্পকলা আয়ত্ত করেছিল, শেষের পনেরো বছরে সেই নিপুণ শিল্পকলার ষোলো আনাই সম্পূর্ণ করে ফেলে। অর্থাৎ জাল ভোট, ভুতুড়ে ভোট, ছাপ্পা ভোটের নির্লজ্জ ব্যবহার মানুষের ভিতরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। ২০১১-র নির্বাচনে সেই ক্ষোভের ফল বামফ্রন্ট টের পায় ভোটবাক্সে। মোট ভোটার ৫,৬৩,২১,৭৩৬ জনের মধ্যে ৪,৭৬,৬১,৬২৩ জনই ভোট দেয় তৃণমূল কংগ্রেসের অনুকূলে। কিন্তু পরবর্তী ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের অনুকূলে তীব্রভাবে আছড়ে পড়ে। কিন্তু বিস্ময়কর এক বিপরীত ধর্মী অনুযোগের সমস্বরে আকাশ-বাতাস রণিত হতে শুরু করে যার মূলে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরাচারী অপশাসন এবং ভাতার জোয়ারে মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষের মুখ বন্ধ করে দিয়ে রাজ্যলুট ও ভোটলুটের খেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবার ভোটের আগে 'খেলা

হবে খেলা হবে' বলে ভোটের মাচা জমিয়ে দিতে শুরু করেন এবং দেখা যায় সত্যিই ভোটের দিন 'খেলা' শুরু হয়ে গেছে।

২০১১ থেকে ২০২৬— এই দীর্ঘ দেড় শতকে রাজ্য জুড়ে যে খেলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবার খেলেছেন তা পশ্চিমবঙ্গকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। কী কী হারিয়েছে বাঙ্গালি গত পনেরো বছরে?

প্রথমত, স্বাধীনতা। সরকারে আসীন হওয়ার প্রথমদিন থেকেই একটা অলিখিত বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সরকার এবং শাসক দল বিরোধী কোনো কথা বলা যাবে না। বললে হয় তোমায় মাওবাদী হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে জেলে পোরা হবে, নয় তোমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। তা সে রাম শ্যাম যদ মধু থেকে অথবা কোনো সাংবাদিক বা কলমচি। অথবা তোমায় বা তোমার পরিবারের কাউকে ঘরে ঢুকে হত্যা করা হবে এবং এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়, অপরাধীরা ধরা পড়বে না। পড়লেও তারা আদালতে জামিন পেয়ে যাবে এবং আবার একই কাজ তাদের দিয়ে করানো হবে।

দ্বিতীয়ত, এইভাবেই গত পনেরো বছরে লক্ষ লক্ষ তৃণমূলি গুন্ডার বাহিনী তৈরি করা হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে যারা একদিকে প্রচার করবে শাসক দলের স্লোগান— 'সততার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়' এবং 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' স্লোগান তুলে, অন্যদিকে তারাই হবে স্কুল কলেজে ভর্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা এমনকী ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগের নিয়ামক।

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষভাবে সরকারি মদতে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবুজসাথী, যুবশ্রী ইত্যাদি হাজারো চকমকে নামে ভরা ভাতা নিয়ে চলবে 'উন্নয়ন' নামক কাটমানির খেলা। কিছু বললেই দরজায় এসে দাঁড়াবে যম। ছেলের সামনে বাপের গলা কাটা হবে। মায়ের সামনে ছেলের গলা কাটা হবে এবং শেষপর্যন্ত মায়ের হাতে প্রতি মৃতদেহ পিছু ধরিয়ে দেওয়া হবে দু' লক্ষ টাকার চেক এবং মায়ের হাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের হাজার, দেড় হাজার, সতেরোশো টাকা। সরকার জানত— রক্ত ধুয়ে যাবে আর মানুষের স্মৃতি দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু।

চতুর্থত, শাসকদলের মদতে আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তার 'অভয়া'কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হবে এবং তার মায়ের হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে দশ লক্ষ টাকার বাণ্ডিল সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে। সাউথ কলকাতা আইন কলেজে শাসকদলের ছাত্রনেতা কলেজেরই ছাত্রীকে ধর্ষণ করবে। সরকার গ্রেপ্তার করেই দায়িত্ব শেষ। ফলত কামদুনি রেপ কেস, পার্কস্ট্রিট রেপ কেসকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করবেন— ছোট্ট ঘটনা, স্বেচ্ছাসহবাস, কিংবা গণিকা ব্যবসায়ের তত্ত্ব। আর ধর্ষিতাদের ওপর চাপ দেওয়া হবে— মিটিয়ে নাও। ধর্ষিতা ক্ষতিপূরণ পাবে দু' লক্ষ টাকা।

পঞ্চমত, বিনা পয়সার স্কুল ইউনিফর্ম, বই, মিড ডে মিল, সাইকেল বিলিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হবে— রাজ্য সরকার শিক্ষার অগ্রগতিতে কত কিছুই না করছে। সুনাম কুড়োতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে গুঁজে দেওয়া হবে মোবাইল ফোন, ট্যাব। আর একটার পর একটা স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। গত ১৫ বছরে সাড়ে আট হাজারেরও বেশি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। গত ১৫ বছরে রাজ্যে ৩০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে ন্যূনতম পরিকাঠামো ছাড়াই। বিভিন্ন স্কুলের ২-৩টি ঘর ভাড়া নিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র-ছাত্রী হাতে গোনা। তাও তারা আসে না। কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকা কম। ক্লাস হয় না। রাজ্য জুড়ে যা হয়েছে তাকে বলাই যায় শিক্ষার শ্রাদ্ধ করেছে তৃণমূল সরকার।

ষষ্ঠত, সীমাহীন দুর্নীতি। কয়লা চুরি, বালি চুরি, রেশন চুরি, বন্যার তেরপল চুরি, মিড ডে মিলের চাল আলু ডিম চুরি, আবাস যোজনার টাকা চুরি, একশো দিনের কাজের টাকা লুট, চাকরি চুরি, এমনকী ভাতার টাকাও চুরি। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বান্ধবীর ফ্লাটে মেলে টাকার পাহাড়, সোনার টিলা আর বান্ধবীকে খুশি করার জন্য উপকরণ। মন্ত্রী থেকে এমএলএ, বিধায়ক থেকে সাংসদ, পুর চেয়ারম্যান থেকে পঞ্চায়েত সদস্য— ইডি, সিবিআইয়ের তল্লাসি চলে ঘরে ঘরে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়। টাকা গোনার জন্য আসে মেশিনের পর মেশিন। কিছু লোক জেলে যায়, আবার জামিনে বেরিয়ে এসে চুরি করে।

সপ্তমত, রাজ্য সরকার দেনার দায়ে দেউলিয়া। মোট ঋণ আট লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। তাই কেন্দ্রকে খরচের হিসেব দিতে পারে না। ফলত, ম্যাচিং গ্রান্টের টাকা জোটে না। পুরকর্মীরা মাইনে পান না। সরকারি কর্মীরা পাওনা ডিএ পান না লক্ষ কোটি টাকার। শিক্ষকরা অধ্যাপকরা আতঙ্কে ভোগেন— কবে থেকে বন্ধ হয়ে যাবে মাস মাইনা। ঠিক যেমন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা জানে না, কবে ডিম পাবে, আদৌ পাবে কিনা মিড ডে মিলের থালায়।

অষ্টমত, রাজ্যে শিল্প আসে না। কারণ এই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাড়িয়ে দিয়েছেন টাটার মতো শিল্পপতিকে সিঙ্গুরের মাটি থেকে। তারপর থেকে বছর বছর শহরে জাঁকিয়ে বসে শিল্প বৈঠক যার পোশাকি নাম 'এগিয়ে বাংলা', কিন্তু প্রচারের ঢক্কানিনাদে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। মুখ্যমন্ত্রী সপার্ষদ ঘন ঘন বিদেশ ছোটেন শিল্পপতি ধরতে। বছরের শেষে দেখা যায়— ছিটেফোঁটা কিছু 'কুটির শিল্পে'র আগমনী গান গেয়ে পিছিয়ে 'বাংলা'।

নবমত, তৃণমূল সরকার চৌত্রিশটি মালটি-স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করেছে মূলত গ্রামীণ এলাকায়। অধিকাংশ হাসপাতাল নামেই মালটিস্পেশালিটি, আসলে কোনো জরুরি পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামোই নেই। তাই গ্রামীণ রোগীদের ছুটে আসতেই হয় কলকাতায় এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে। শেষে ঠাঁই হয় গ্যাঁটের কড়ি গুনে সেই বেসরকারি নার্সিং হোমেই।

এও বাহ্য!

চমকে যেতে হয় পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির হাল দেখলে। একটা সরকার মাত্র পনেরো বছরে একটা রাজ্যের, একটা জাতির, একটা সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও ঐতিহ্যের মেরুদণ্ড, কোমর কীভাবে গুঁড়িয়ে দিতে পারে তা বিশ্লেষণ করলে হা ঈশ্বর বলা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। যে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতাকে লন্ডন বানাবেন, দার্জিলিংকে সুইজারল্যান্ড বানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি গোটা রাজ্যের সার্বিক পরিকাঠামোকে বরবাদ করে দিয়েছেন পরিকল্পিত ভাবে। তিনি ও তাঁর জো হুজুর পার্ষদরা যতই রাজ্যের অস্মিতা রক্ষার স্লোগান তুলুন না কেন, প্রমাণ হয়েছে রাজ্যের যুবসমাজের আচরণ, যুবসমাজের মুখের ভাষা সবকিছুতে স্পষ্টতই মিশে আছে সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস বা

Cultural Arocition। মুখ্যমন্ত্রী সাঁওতাল রমণীদের হাত ধরে মঞ্চে নাচেন আর গ্রামেগঞ্জে শহরে বাজে ডিজে— মধ্যরাতের পরেও। এমনকী নেতা-নেত্রীদের ভাষণেও ভাষা সন্ত্রাস আছড়ে পড়ে বঙ্গসংস্কৃতির প্রবহমান ঐতিহ্যের ওপর। স্কুলপাঠ্য বইও নিষ্কৃতি পায়নি— ইতিহাসের ভুল তথ্য, আজগুবি বানান আর বিষয়ের বিশেষণে। সেগুলোই সরকার স্বীকৃত বই হয়ে বাজারে বিকোয়। যেমন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নাকি কোটি কোটি টাকার রয়্যালটি পান একটি প্রকাশকের কাছ থেকেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ১৫৩টি বই প্রকাশ করেছেন ২০২৫ সালের মধ্যে। কারা কেনেন? কারা পড়েন? সে কথা কোনো তৃণমূল নেতা-কর্মীও বলতে পারবেন না। কিন্তু সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগারগুলিকে কিনতেই হয় বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারি নির্দেশের চাপে। পাঠাগারের কর্মকর্তারাই বলতে পারবেন— বইগুলির ওপর কত কেজি ধুলো পড়ে বছরে আর উইপোকায় কাটে কতগুলি। ভাষা, শিল্প, মূল্যবোধ, মানবিকতা, সহযোগিতা, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাতে হাত ধরা, সৌভ্রাতৃত্বের যে সংস্কৃতির জন্য বঙ্গদেশ ছিল গোটা বিশ্বে পুরোধা এবং সম্মানিত, গত পনেরো বছরে তা ধুলোয় মিশে গেছে। লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোনো এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যে আচরণ করে এসেছেন, তা তো ইতিহাস। আর তাঁর নিজের মুখে ছত্রে ছত্রে ভুলে ভরা কবিতা, গান, ভাষ্য, মন্ত্রপাঠ, ঐতিহাসিক ঘটনার যে শ'য়ে শ'য়ে নজির তিনি রেখে গেছেন, তাতে বিদেশের মাটিতে বাঙ্গালি পরিচয় দিলেই শুনতে হয়, দিদির রাজ্য...? হা হাহা!

শেষে যা না বললেই নয়। তা হলো মিথ্যাভাষণ, অপশাসন, অরাজকতা আর হাস্যকর দাবির পটভূমিতে অহংকার স্বেচ্ছাচারিতা ও ভয়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় পিসি-ভাইপোর অবদান।

আজ বাঙ্গালি নিঃস্ব। পশ্চিমবঙ্গ দেউলিয়া। এখানে হাত আছে, কাজ নেই। কাজ আছে ভাত নেই। গোটা রাজ্যটা দাঁড়িয়ে আছে শিকড় থেকে শুকিয়ে যাওয়া আকাশপানে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেওয়া আর্তনাদ মুখর বৃদ্ধের মতো। সবটা মিলিয়ে এক নেই-রাজ্যের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি, যে ছবি এঁকে গেছেন কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কবিতায়। মা হারিয়েছে সন্তানকে, সন্তান হারিয়েছে বাবাকে, বাবা হারিয়েছে কন্যাকে, শিক্ষক হারিয়েছে চাকরি, নারী হারিয়েছে সতীত্ব, পুরুষ হারিয়েছে মেরুদণ্ড। মস্তানি, বাহুবল, প্রকাশ্য দিবালোকে পিস্তল আর রিভলবারের দাপাদাপি। বোমাবাজির আতঙ্ক নির্বাচনী রাজনীতিকেও প্রহসনে পরিণত করেছিল শাসকদল। তাদের জনবল, তাদের মানুষের পাশে থাকার। ভোটের আগেও তারা দাবি তুলেছিল— ২৩০টিরও বেশি আসন জিতবে তৃণমূল অনায়াসেই। কিন্তু ভুল নায়িকার ভুল অভিনয়, ভুল লেখকের ভুল স্ক্রিপ্ট নিয়ে কি চিরকাল ধোঁকা দেওয়া যায়? ধোঁকাবাজির রাজনীতি করতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছিলেন মানুষ ধোঁকা খেতে খেতে শ্রান্ত, ক্লান্ত। বুঝতেই পারেননি, মানুষ প্রস্তুত সমস্ত অহমিকা, সমস্ত স্বৈরাচারিতা, সমস্ত অপশাসনের জবাব দেওয়ার জন্য।

ধন্যবাদ নির্বাচন কমিশনকে। তাঁরা গত ৭৬ বছরের ভূতুড়ে নির্বাচনকে এবার ভূতমুক্ত করেছেন। মানুষ পথে নেমেছে নিজের ভোট নিজে দেবে বলে। আর সেই ভোট বাক্সে এক আঙুলে গলা টিপে মারার মতো শাসকদলের প্রতিনিধিদের ঠেলে দেবে বঙ্গোপসাগরে। বামফ্রন্টের ৩৪ বছর আর তৃণমূলের ১৫ বছর— প্রায় ৫০ বছর ধরে চলেছে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের আঙিনায় সংকীর্ণ আঞ্চলিক রাজনীতি। নিজেদের গদি অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে রাজ্যটাকেই কেন্দ্রের কাছে হেয়, দুর্বিনীত এবং সবশেষে দেউলিয়া করে ছেড়েছে। একটি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় কেন্দ্র ছাড়া রাজ্য আর রাজ্য ছাড়া কেন্দ্রের অস্তিত্ব অর্থহীন। সেই অর্থহীন অস্তিত্বের রাজনৈতিক স্বার্থপরতার প্রতিবাদও ছিল এবারের ভোট।

অর্থাৎ এবারের ভোটের সুনামিতে অংশগ্রহণকারী ৬,৩২,৫৬,১৪৬ ভোটারের ৪৫.৮৪ শতাংশ ভোটই পড়েছে মূল বিরোধী দল বিজেপির প্রার্থীদের পক্ষে। সদ্যপ্রাক্তন শাসকদলের জুটেছে ৪০.৮০ শতাংশ। হিসেব মতো তৃণমূলের প্রতিটি পরাজিত প্রার্থীর চেয়ে প্রতিটি বিজেপি প্রার্থী গড়ে ২৮ হাজার করে ভোট বেশি পেয়েছেন। এই বিপুল ভোটের অঙ্কই বলে দেয়, মুসলমান ভোটাররা বিক্ষুব্ধ হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ তৃণমূলের ভোটব্যাংকে জোরালো ধাক্কা দিয়ে ভোটাররা ভোট দেওয়ার সুয়োগ পেয়ে উজাড় করে দিয়েছেন নিজেদের ভোট ক্ষোভের আগুনে সেঁকে নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর ভাইপো বুঝতেই পারেননি সুনামি আসছে। ভয়ঙ্কর সুনামি যে শুধু কিছু হিসেবকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না, তৃণমূলের ঘর ভাসাবে, ঘরের বাসিন্দাদের ভাসাবে। যে যতই অজুহাত দিক, নির্বাচন কমিশন যদি ৯১ লক্ষ ভোটারকে আটকে না রাখত, তাহলে ভোটের ফল অন্য হতো, তাঁদের বলব, ভালো করে অঙ্কটা ভাবুন। তৃণমূলের ওপর চালাকিই এই ৯১ লক্ষ ভোটারকে বিপদে ফেলেছে। এখন বিপত্তারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে একমাত্র বিজেপি এবং দাঁড়াবেও। কারণ কোনো গণতান্ত্রিক দেশে প্রকৃত নাগরিকদের ভুল বোঝানোর যে খেলা তৃণমূল কংগ্রেস পনেরো বছর ধরে খেলেছে তার ফল পেয়েছে। আগামীদিনে নতুন যে খেলা খেলতে চাইছেন নেত্রী দিল্লির ধাঁচে অস্তিত্বহীন আরও একটা ইন্ডিয়া জোটের মতো বেঙ্গল জোটের ঘোঁট পাকাতে, সেখানে আবার একটা জোরালো ধাক্কা খাবেন নিঃসন্দেহে।

ফিরে আসি আমার এই প্রবন্ধের প্রথমার্ধের ধারাবাহিকতায়। আগেই বলা হয়েছে, ৮২৩ বছর পর বঙ্গপ্রদেশে হিন্দুত্বের পুনর্জন্ম হলো। যে হিন্দু জেগেছে, যে হিন্দুত্বের পুনর্জন্ম হয়েছে, এই পুনর্জন্ম এই হিন্দু জাগরণ, জনজাগরণকে সহজে কোনো কৌশলেই ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ ভয়যুক্ত পরিবেশ ভয়মুক্ত পরিবেশে পরিণত হয়েছে এই ভোটের জোয়ারে।

ইতিহাস বদলায়। কিছু ইতিহাস হারিয়ে যায়। আর কিছু ইতিহাস পরম্পরার শক্তিতে, ঐতিহ্যের শৌর্যে ফিরে আসে। এবারের ভোটের ফলাফল সেই পরম্পরার ধারাবাহিকতার স্পষ্ট নজির এবং অবশ্যই কালো ইতিহাসকে চিরকালের জন্য ভুলিয়ে দেওয়ার নজির। এবার ভোটের ফলাফল মানুষের সৎসাহসের নজির। গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নজির, যা গোটা ভারতকে পথ দেখাবে। যে পথ সমস্ত অপশাসন ও অরাজকতাকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আলোর ঠিকানায়। □

মিথ্যাচার, দাম্ভিকতা আর অহংকারের পতন

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় শুধু একটি নির্বাচনী ফল নয়, বরং মানুষের জমে থাকা অসন্তোষ, কৌশলগত ভুল এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার মিলিত প্রতিফলন। এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক পালাবদল নয়, বরং ভোটারদের মনের পরিবর্তনেরও স্পষ্ট ইঙ্গিত।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের অভিযোগ বিরোধী দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের আগে দেওয়া অনেক প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না এবং মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। মানুষের দাবি, তৃণমূল মানেই 'ভাঁওতা' বা মিথ্যাচার। তৃণমূল শাসনের ইতির এটিও একটি কারণ। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে তৃণমূল কংগ্রেসের পতন বা হারের নেপথ্যে বেশ কিছু কারণ উঠে এসেছে, যার মধ্যে নেতাদের 'দাম্ভিকতা' বা দেমাগ-অহংকারকে বড়ো কারণ হিসেবে দেখছেন অনেকে। স্থানীয় নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার এবং ক্ষমতার অহংকারের অভিযোগ ব্যাপকভাবে শোনা গেছে। বিজেপির উত্থানের পাশাপাশি শাসকদলের একাধিক দুর্বলতা এই ফলাফলে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তবে তৃণমূল শাসন পতনের উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হলো :

প্রথম ও সবচেয়ে বড়ো কারণ--- প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া। ২০১১ সালে যে 'পরিবর্তন'-এর জোয়ারে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল, ১৫ বছর পর সেই একই মনোভাবই উলটো স্রোত হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলে প্রশাসনিক ক্লান্তি, নীচুতলার সংগঠনে অসন্তোষ এবং সিন্ডিকেট-রাজ, কাটমানি বা দুর্নীতির অভিযোগ— সব মিলিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। এই ক্ষোভই ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জেহাদি শক্তির উত্থানে গত কয়েক বছরে হিন্দুত্বের মনোভাব পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে। বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তেজনা ও সংঘাতের পরিবেশ সেই প্রবণতাকে আরও জোরদার করেছে। অন্যদিকে, মুসলমান ভোট একজোট থাকেনি--- আইএসএফ, কংগ্রেস, সিপিএম-সহ একাধিক শক্তির মধ্যে বিভাজন তৃণমূলের থেকে সরে গিয়েছে। ফলে বহু মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাতেও বিজেপি অপ্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছে।

তৃতীয় কারণ হিসেবে উঠে এসেছে এসআইআর নিয়ে বিতর্ক। নির্বাচন কমিশনের এই প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ রাজনৈতিকভাবে জোরালো হলেও, প্রচারের বড়ো অংশ জুড়ে শুধুই এই ইস্যুতে আটকে থাকা— উন্নয়ন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অভাবকে আরও স্পষ্ট করেছে। ভোটারদের একাংশের কাছে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

চতুর্থত, কর্মসংস্থান, দুর্নীতি ও সামাজিক ইস্যু। নিয়োগ দুর্নীতি, চাকরি বাতিল, বেতন কাঠামো নিয়ে অসন্তোষ— এই সব বিষয় দীর্ঘদিন ধরে জনমানসে ক্ষোভ তৈরি করেছে। শিল্প বিনিয়োগের অভাব এবং স্থায়ী চাকরির সংকটও বড়ো বিষয়। পাশাপাশি আরজি করের মতো ঘটনা মহিলা ভোটব্যাংকে প্রভাব ফেলেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।

পঞ্চম কারণ--- বাঙ্গালি অস্মিতার কৌশল ভোঁতা হয়ে যাওয়া। ২০২১-এ যে 'বাংলার গর্ব' বার্তা কার্যকর ছিল, ২০২৬-এ তা আর তেমন কাজ করেনি। বিজেপি নিজস্ব কৌশলে 'বহিরাগত' তকমা একেবারে ঝেড়ে ফেলেছে— স্থানীয় নেতৃত্ব, সাংস্কৃতিক বার্তা এবং প্রচারে বদল এনে। ফলে মধ্যবিত্ত ও তরুণ ভোটাররা বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। এর পাশাপাশি সংগঠনের ভিতরে ভাঙন, তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থতা এবং 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের প্রতিশ্রুতি— এই সবকিছু মিলিয়েই রাজ্যে পরিবর্তনের পালে হাওয়া জুগিয়েছে। ১৫ বছরের শাসনের পর এই ফলাফল তাই শুধু রাজনৈতিক পালাবদল নয়, বরং ভোটারদের মনের পরিবর্তনেরও স্পষ্ট ইঙ্গিত।

—মনোরঞ্জন সাঁতরা,
বেঙ্গাই, হুগলি।

যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি ফেরানো হোক

রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় বসেছে, মানুষের অনেক আশা- আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ২৬ হাজার শিক্ষকদের আশা অন্যতম। এই চাকরি প্রার্থীদের চাকরি গিয়েছে বিচারপতিদের কলমের খোঁচায়। আদালতের নির্দেশে তারা আবার পরীক্ষায় বসেছেন এবং গতবারের পাশ হওয়া চাকরিপ্রার্থীদের অনেকেই হয়তো এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন, তাই বর্তমান সরকার এই ওএমআরের ফলাফলের ভিত্তিতে কৃতকার্যদের তালিকা প্রস্তুত করে আদালতে আবেদন করুক এবং সর্বশেষ পরীক্ষায় কৃতকার্যদেরও তালিকা প্রস্তুত করুক। এই দুই তালিকায় যাদের একই নাম সাফল্যের তালিকায় রয়েছে এরূপ নামের একটি সম্মিলিত তালিকা আদালতে পেশ করে এই জটিল নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ করে নিয়োগ সম্পন্ন করুক। কারণ রাজ্যজুড়ে শিক্ষকের অভাবে যেসব স্কুল ধুঁকছে তাদের সুরাহা করুক বর্তমান সরকার অতি সত্বর। আরও একটি কথা, যেসব কর্মকর্তা কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আরও একটি কথা, যে আদালত তার ২৬ হাজারের যে নিয়োগ বাতিল করেছিল তা খারিজ করে দিক।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলি।

আজ পশ্চিমবঙ্গ জিতেছে, আগামীতে কেরলম জিতবে

সোমনাথ গোস্বামী

কেরলম রাজনীতিতে আজ যে পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এক সুদীর্ঘ ও রক্তাক্ত আদর্শগত লড়াইয়ের যৌক্তিক পরিণতি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পদ্ম শিবিরের তিনটি আসনে বিজয়লাভকে অনেকেই সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখতে পারেন, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন যে এই তিনটি সংখ্যাই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক মহাপ্লাবনের স্পষ্ট ইঙ্গিত। আজ ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গে ২০৭টি আসন নিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির সরকার গঠন এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা, তখন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গেও এই দীর্ঘ যাত্রার সূচনা হয়েছিল মাত্র তিনটি আসন দিয়ে। কেরলম আজ ঠিক সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ২০১৬ সালে— বাম ও ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির দুর্গে প্রথমবার বড়ো ফাটল ধরার সেই সন্ধিক্ষণ।

কেরলমের এই জাগরণের নেপথ্যে কাজ করেছে গত ১০ বছরের এলডিএফ শাসনের ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও প্রশাসনিক দেউলিয়াপনা। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন সরকার কেরলমকে এক গভীর ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ২০২৬ সালের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেরলমের মোট ঋণের বোঝা আজ ৫ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। রাজস্ব ঘাটতি ২.১ শতাংশ এবং রাজকোষ ঘাটতি জিএসডিপি-র ৩.৫ শতাংশের বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছেছে। গত এক দশকে কেরলমের অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন নিশ্চিত করতেও সরকারকে নিয়মিত বাজার থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে। শিল্পায়নের অভাব এবং বামপন্থী ক্যাডারদের দৌরাত্ম্যের কারণে কেরলম আজ বিনিয়োগকারীদের কাছে এক প্রতিকূল ভূমি। রাজ্যের মেধাবী যুবসমাজ বাধ্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য বা ভারতের অন্যান্য উন্নত রাজ্যে পাড়ি দিতে। এই দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক দুর্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে, তার প্রতিফলন আজ ব্যালট বক্সে দৃশ্যমান।

এই রাজনৈতিক উত্তরণের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; বরং এটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতা পার্টির হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর রক্তে রাঙানো। গত দশ বছরে কেরলমের মাটিতে বামপন্থী ক্যাডাররা যে নৃশংস রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালিয়েছে, তা সভ্য সমাজের কল্পনাকেও হার মানায়। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, শেষ এক দশকে কেরলমে রাজনৈতিক হিংসার কারণে প্রায় ৫২ জন স্বয়ংসেবক ও বিজেপি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন এবং কয়েক হাজার কর্মী মারাত্মকভাবে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। শুধুমাত্র কান্নুর ও পালক্কাড় জেলাতেই আমাদের অসংখ্য কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। বামপন্থী ক্যাডাররা প্রশাসনিক মদতে যেভাবে রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে, তা ছিল এক পরিকল্পিত নির্মূল অভিযান। কিন্তু যতবারই তারা আমাদের রক্ত ঝরিয়েছে, ততবারই কেরলমের মাটিতে জাতীয়তাবোধের শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত হয়েছে। এই অমানুষিক অত্যাচারের পাহাড় ডিঙিয়েই আজ কেরলমের বিধানসভায় সনাতনী চেতনার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

জাতীয়তাবোধের এই অগ্রগতির ধারা আরও সুসংহত ও শক্তিশালী হয়েছে ২০২৫ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে। কেরলমের মতো রাজ্যে, যেখানে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে বামপন্থী ক্যাডারদের আধিপত্য দীর্ঘদিনের, সেখানে ১৪.৭ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করা এবং ৫০০-র বেশি পঞ্চায়েত আসনে জয়লাভ করা এক অভূতপূর্ব সাংগঠনিক সাফল্য। সবচেয়ে বড়ো মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটি ছিল তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনের ফলাফল, যেখানে ১০০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫০টি জিতে একক বৃহত্তম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। একটি রাজ্যের রাজধানীর প্রশাসনিক রাশ হাতে আসা এবং পুরপরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ এখন আর উগ্রবাদ ও বামপন্থী নৈরাজ্যের জোয়াল বয়ে বেড়াতে রাজি নয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সরাসরি সুফল এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের সংমিশ্রণ গ্রামগঞ্জের প্রতিটি ঘরে পদ্ম চিহ্নের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছে, যা আগামী দিনে বাম দুর্গের ভিত পুরোপুরি নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কেরলমে যে বীজ আজ রোপিত হয়েছে, তা আগামীর মহাবৃক্ষ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রাখে। শবরীমালা আন্দোলন থেকে শুরু করে মন্দিরের স্বাধিকার ও পবিত্রতা রক্ষার যে লড়াই আমরা লড়ছি, আজ কেরালাবাসী তাকেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কেরলম আজ পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ সালের সেই ঐতিহাসিক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ যখন পশ্চিমবঙ্গে ২০৭টি আসন নিয়ে নবজাগরণের সূর্যোদয় ঘটেছে, তখন কেরলমের ৩টি আসন আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে কোনো বিপ্লবই একদিনে আসে না। গত ১০ বছরের ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং আমাদের অগণিত কর্মীর আত্মবলিদান বৃথা যাবে না। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ যা দেখেছিল, ২০২৬-এ কেরলম ঠিক সেই রাজনৈতিক বিবর্তনের সাক্ষী হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা বলছে, কেরলম এখন আর বাম-নাস্তিকদের অভয়ারণ্য নয়; বরং এটি এখন সনাতনী চেতনার এক নতুন শক্তিকেন্দ্র। দক্ষিণাপথের এই পবিত্র ভূমিতে পরিবর্তনের ঘণ্টা বেজে গেছে। ২০২৯-এর লক্ষ্য এবং পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে কেরলমে জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, তা এখন অপরাজেয় ও অপ্রতিরোধ্য। আজ পশ্চিমবঙ্গ জিতেছে, কাল কেরলম জিতবে।

হিন্দু নারীর ধর্মীয় আচরণ ও পূজা অর্চনা

মৌ চৌধুরী

'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' এটি একটি প্রবাদবাক্য হলেও কথাটির মধ্যে চিরন্তন সত্য লুকিয়ে আছে। গৃহে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি নির্ভর করে একজন ভক্তিমতী নারীর ইচ্ছে ও কাজের উপর। ভারতবর্ষে নারীকে দেবী দুর্গার অংশ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। মনুসংহিতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে নারীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা লেখা রয়েছে। একজন হিন্দু নারীর প্রত্যেকটা আচরণ গৃহস্থ জীবনে মঙ্গল জয় আনে। উপোস পূজা-অর্চনায় তারা নিয়োজিত। স্বামী ও পরিবারের মঙ্গল কামনায়, সংসারে শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্রত উদ্‌যাপন, প্রদীপ জ্বালানো নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আয়োজন করে থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা আরতি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি করা হার্টের ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। তুলসীমঞ্চে প্রদীপ ও ধূপ জালানো তাদের দৈনন্দিন কাজ।

পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনায় তারা নিজেকে সদা ব্যস্ত রাখেন। তাছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বণ তো আছেই। নানা উপবাস, ব্রত, ঘরের নিত্য পূজা এবং যারা গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত তারা নিত্য পূজার সঙ্গে গীতাপাঠ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ, জপ ও ধ্যান করেন। তাতে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হয়, সংসারে মঙ্গল হয়। ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে তারা মানত রাখেন। বিভিন্ন মন্দিরে পূজা দিয়ে থাকেন। এগুলো সংসার জীবনের বিশেষ দিক।

পূর্ণিমাতে সত্যনারায়ণের পূজা কিংবা গৃহ শান্তির জন্য হোম যজ্ঞ করে থাকেন। বিশেষ মন্ত্রপাঠে সংসারের শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সকলে মিলে একসঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের আহ্বান করে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করেন। এর একটা দিক আছে। পূজা উপলক্ষ্যে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, বাড়িতে তুলসীমঞ্চ স্থাপন করা, প্রতিদিন প্রদীপ দেখানোর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। তুলসীগাছ পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করে। তুলসীর বাতাস শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। বিভিন্ন দেবতার পূজার নিয়ম ও আলাদা মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্র উচ্চারণে মানসিক শান্তি আসে। নারীরা গৃহ কর্মে নিপুণা।

এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ভারতীয় নারীদের সহনশীলতা এবং মানিয়ে চলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে এই নিত্যকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে তার সংসারে শান্তি সমৃদ্ধি সুখ আনার চেষ্টা করেন। ঈশ্বর অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তিকে কেউই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যারা নাস্তিকতার দোহাই দিয়ে এই কর্মগুলি থেকে বিরত থাকেন, একটা সময় তাদের অনুশোচনা করতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে শরীর মন দুটোই ভালো থাকে। সংসারে ঝগড়া কলহ থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায় এবং মিতব্যয়ী মনোভাব তৈরি হয়। সমস্যা থাকবে কিন্তু সুচিন্তা দিয়ে সেটা সমাধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভক্তিই শক্তি। নিজের অজান্তেই অনুভব করা যাবে পরিবর্তন কতটা সুন্দর করেছে জীবনকে। মহাজাগতিক শক্তির আধার নারী জন্ম সার্থক। নারীর ধর্মীয় আচরণ অনুষ্ঠান যুগযুগান্ত ধরে চলে এসেছে। সুচিন্তা ও একটা সংস্কারের মধ্যে নারী জীবন একটি আলাদা যাত্রা। আর সেই যাত্রার নামই শান্তি। শান্তি বজায় থাকলে সবকিছুই শান্তিতে সম্পন্ন হয়। ▯

সাতসকালের বদ অভ্যাসগুলোই নীরবে বাড়িয়ে দিচ্ছে বয়স !

এখনই সতর্ক না হলে ক্ষতি আপনারই

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বয়স বাড়া জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। সময়ের স্রোতকে থামানোর ক্ষমতা কারও নেই। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও চেহারায় যে পরিবর্তন আসে, তা সহজে মেনে নিতে পারেন খুব কম মানুষই। তাই আজকের দিনে ফিটনেস, ডায়েট, স্কিন কেয়ার— সবকিছু নিয়েই সচেতন। অথচ এত কিছুর পরেও অজান্তেই এমন কিছু অভ্যাস রোজের জীবনে ঢুকে পড়ে, যা বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করে তোলে। বিশেষ করে দিনের শুরুতে, অর্থাৎ সাতসকালে করা কয়েকটি ভুল অভ্যাস শরীর ও ত্বকের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আপনি কি জানেন, আপনার প্রতিদিনের সকালই হয়তো আপনাকে বয়সের তুলনায় অনেকটাই বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে? এখনই জেনে নিন সেই অভ্যাসগুলো এবং সতর্ক হন।

প্রাতঃরাশ এড়িয়ে যাওয়া সবচেয়ে বড়ো ভুল আজকের ব্যস্ত জীবনে অনেকেই সকালে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েন। ফলে প্রাতঃরাশ বাদ পড়ে যায়। কিন্তু খালি পেটে দিনের শুরু শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সকালে না খেলে শরীরে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে। পাশাপাশি মেটাবলিজমের গতি কমে যায়, যার প্রভাব পড়ে ত্বক ও শক্তির উপর। নিয়মিত প্রাতঃরাশ না করলে ত্বক নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে, ক্লান্তি ভর করে এবং ধীরে ধীরে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। তাই সকাল শুরু হোক হালকা কিন্তু পুষ্টিকর খাবার দিয়ে— এটাই সুস্থ ও তরুণ থাকার প্রথম ধাপ।

ঘুম ভাঙতেই মোবাইল ফোনে চোখ-অ্যালার্ম বন্ধ করতে ফোন হাতে

নেওয়া-এ অভ্যাস আজ প্রায় সকলেরই। কিন্তু এই সামান্য কাজটির প্রভাব যে কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের নীল আলো চোখ ও মস্তিষ্কের উপর চাপ ফেলে। তার উপর যদি চোখে পড়ে একের পর এক নেতিবাচক খবর, তাহলে মানসিক চাপ আরও বেড়ে যায়। এর ফলে মনোযোগ কমে, উদ্বেগ বাড়ে এবং সারাদিনের মুড নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘদিন এমন চললে মানসিক চাপের প্রভাব ত্বকেও দেখা দেয়— রিঙ্কলস্, ডার্ক সার্কেল, নিস্তেজ ভাব সবই বাড়তে থাকে। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে অন্তত ২০-৩০ মিনিট ফোন থেকে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন। খালি পেটে কফি খাওয়া শরীরের জন্য একেবারেই ভালো নয়। কফি শরীরের অ্যাসিডিটির মাত্রা বাড়ায়, হজমের সমস্যা তৈরি করে এবং স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলে।

এর পাশাপাশি ত্বকও তার প্রভাব থেকে রেহাই পায় না। নিয়মিত খালি পেটে কফি খেলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, জলশূন্যতা দেখা দেয় এবং বলিরেখা দ্রুত পড়তে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে কফি খেতে হলে তার আগে হালকা কিছু খাওয়া জরুরি। নাহলে এই অভ্যাসই অকাল বার্ধক্যের কারণ হয়ে দাঁড়তে পারে। দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা ও রোদ এড়ানো যাঁরা রাত জাগেন এবং সকালে দেরিতে ওঠেন, তাঁদের জীবনে ভোরের সূর্য যেন অচেনা। অথচ সকালের মৃদু রোদ শরীরের জন্য অমৃতসম। এই সময়ের সূর্যালোক থেকে পাওয়া যায় ভিটামিন ডি, যা হাড়, ত্বক ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত রোদ না পেলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি তৈরি হয়, যার প্রভাব পড়ে ত্বক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর। ত্বক হয়ে ওঠে প্রাণহীন, ক্লান্তি বাড়ে এবং বয়সের ছাপ দ্রুত ফুটে ওঠে। তাই প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ ভোরের আলো গায়ে মাখার চেষ্টা করুন। অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো ও মানসিক চাপ সকালে উঠেই যদি তাড়াহুড়ো, দুশ্চিন্তা আর কাজের চাপ শুরু হয়, তাহলে তার নেতিবাচক প্রভাব সারাদিন থাকে। এই মানসিক চাপ শরীরে কর্টিসলের মাত্রা বাড়ায়, যা বয়স বাড়ার অন্যতম কারণ। সকালে কিছুটা সময় নিজের জন্য রাখুন হালকা স্ট্রেচিং, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা কয়েক মিনিটের নীরবতা মন ও শরীরকে অনেকটাই সতেজ করে তোলে। মনে রাখুন ছোটো অভ্যাসেই বড়ো পরিবর্তন বয়স থামানো যায় না, কিন্তু বয়সের গতি যে কমানো সম্ভব তা প্রমাণিত। তার জন্য দরকার শুধুমাত্র কিছু ছোটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসে পরিবর্তন। দিনের শুরু যদি স্বাস্থ্যকর হয়, তার প্রভাব পড়ে গোটা দিনের উপর। তাই আগামীকাল সকাল থেকেই একটু সচেতন হোন। আপনার সাতসকালের অভ্যাসই ঠিক করবে আপনি কতটা সুস্থ, কতটা তরুণ এবং কতটা প্রাণবন্ত থাকবেন।

ব্রিগেডে মহাসমারোহে রাজ্য মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

গত ৪ মে ভোটগণনার পর ঘোষিত হয় '২০২৬-পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন'-এর ফলাফল। মোট ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে ভারতীয় জনতা পার্টি। ৮০টি আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দল হয় তৃণমূল কংগ্রেস। দু'টি আসন পায় কংগ্রেস। আমজনতা উন্নয়ন পার্টি দু'টি এবং সিপিআই(এম) একটি আসন পেয়েছে। ২৫শে বৈশাখ— বঙ্গজীবনে পরম্পরাগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। গত ৯ মে রবীন্দ্র জয়ন্তীর এই পুণ্যদিনে কলকাতা-স্থিত ব্রিগেডের ঐতিহাসিক ময়দানে জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম— দু'টি আসনে জয়ী বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল আরএন রবি। রাজভবনের পরিবর্তে খোলা ময়দানে এই অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলেন কয়েক লক্ষ মানুষ। এই ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বঙ্গ রাজনীতির এক নতুন যুগের সূচনা হলো। এদিন সকাল থেকেই কলকাতার পরিবেশ ছিল উৎসবমুখর। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে নিয়ে হুডখোলা জিপে এদিন ব্রিগেডে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী।

ব্রিগেডে রাজ্য মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের মঞ্চে এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা, কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান, হরিয়ানার রাজ্যপাল অসীম কুমার ঘোষ, বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য, রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, এনসিপি নেতা প্রফুল্ল পটেল, প্রবীণ রাজনীতিক মাখনলাল সরকার, বিশিষ্ট রাজনীতিক স্মৃতি ইরানি, বিশিষ্ট অভিনেতা গৌরাঙ্গ (মিঠুন) চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্টজন।

লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে এদিন জনসমুদ্রে পরিণত হয় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মঞ্চে পদার্পণের পর ব্রিগেড ময়দানে উপস্থিত জনসমাবেশের উদ্দেশে আভূমি প্রণাম নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রীজী। ভক্তি সহকারে অনুষ্ঠানমঞ্চে মাথা ঠেকিয়ে প্রণামের পর জনসাধারণের উদ্দেশে অভিবাদন জানান তিনি। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন যে, ১৯৪৭ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ' রাজ্যটির সৃষ্টিকর্তা হলেন ভারতকেশরী

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর ৮০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এরাজ্যে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে পরিচালিত একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। এদিন রাজ্য মন্ত্রীসভার প্রথম পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রীপদে শপথগ্রহণ করেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু ও নিশীথ প্রামাণিক। শপথ গ্রহণের পর শুভেন্দু অধিকারীকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শুভেন্দুবাবুর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন। সমগ্র শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষ পর্যবেক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুব্রত গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব পদে নিয়োগ করা হয় আইএএস আধিকারিক শান্তনু বালাকে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে মুখ্যসচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বর্তমান মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে নয়াদিল্লিতে 'প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার' হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

শপথ গ্রহণের পর জোঁড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছে কবিগুরুর উদ্দেশে প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদানের পর কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছে পূজা নিবেদন করে চেতলায় শীতলামাতার মন্দিরে যান তিনি। সেখানে পূজার্চনার পর বালিগঞ্জ-স্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছে যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের উদ্দেশে প্রণাম জানান মুখ্যমন্ত্রী।

একনজরে ২০২৬-পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

বিধানসভা কেন্দ্র : ১— মেখলিগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : দধিরাম রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,১০৯
পরাজিত : পরেশচন্দ্র অধিকারী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৯,৫২৫
জয়ের ব্যবধান : ২৯,৫৮৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২— মাথাভাঙ্গা (তপশিলি জাতি)
জয়ী : নিশীথ প্রামাণিক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৩,৩৪০
পরাজিত : ড. সাবলু বর্মন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,২৫০
জয়ের ব্যবধান : ৫৭,০৯০

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩— কোচবিহার উত্তর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সুকুমার রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৫৫,৩২৭
পরাজিত : পার্থপ্রতিম রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৪,৯৪৩
জয়ের ব্যবধান : ৭০,৩৮৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪— কোচবিহার দক্ষিণ
জয়ী : রথীন্দ্রনাথ বসু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৪৮২
পরাজিত : অভিজিৎ দে ভৌমিক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৫,১৯৮
জয়ের ব্যবধান : ২৩,২৮৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫— শীতলকুচি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সাবিত্রী বর্মণ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৪,৩৬৭
পরাজিত : হরিহর দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,০৮৯
জয়ের ব্যবধান : ২৫,২৭৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬— সিতাই (তপশিলি জাতি
জয়ী : সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৮,১৮৮
পরাজিত : আশুতোষ বর্মা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৫,৪৬৭
জয়ের ব্যবধান : ২,৭২১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭— দিনহাটা
জয়ী : অজয় রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৮,২৫৫
পরাজিত : উদয়ন গুহ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২০,৮০৮
জয়ের ব্যবধান : ১৭,৪৪৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮— নাটাবাড়ি
জয়ী : গিরিজা শঙ্কর রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৬,৯১১
পরাজিত : শৈলেন্দ্রনাথ বর্মা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯২,২৯৮
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,৬১৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯— তুফানগঞ্জ
জয়ী : মালতী রাভা রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২২,৫২৫
পরাজিত : শিবশঙ্কর পাল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,০৬৮
জয়ের ব্যবধান : ২৬,৪৫৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০— কুমারগ্রাম (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : মনোজ কুমার ওরাঁও (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৩,০৪৪
পরাজিত : রাজীব তিরকে (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯০,১৬৭
জয়ের ব্যবধান : ৫২,৮৭৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১— কালচিনি (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : বিশাল লামা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৭৫৯
পরাজিত : বীরেন্দ্র বরা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,৯১৬
জয়ের ব্যবধান : ৩৭,৮৪৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২— আলিপুরদুয়ার
জয়ী : পরিতোষ দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৩,২৪২
পরাজিত : সুমন কাঞ্জিলাল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭২,৮২২
জয়ের ব্যবধান : ৭০,৪২০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩— ফালাকাটা (তপশিলি জাতি)
জয়ী : দীপক বর্মণ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৪,৩৭০
পরাজিত : সুভাষচন্দ্র রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৮,৩৭১
জয়ের ব্যবধান : ৪৫,৯৯৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪— মাদারিহাট (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : লক্ষ্মণ লিম্বু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০২,৪৮৮
পরাজিত : জয়প্রকাশ টোপ্পো (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬১,৫৭৮
জয়ের ব্যবধান : ৪০,৯১০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫— ধূপগুড়ি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : নরেশচন্দ্র রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৪,৭৯৮
পরাজিত : ডাঃ নির্মলচন্দ্র রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,২৪৮
জয়ের ব্যবধান : ৩৮,৫৫০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬— ময়নাগুড়ি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : ডালিমচন্দ্র রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৭,৪০৩
পরাজিত : রামমোহন রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯০,৯০০
জয়ের ব্যবধান : ৫৬,৫০৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭— জলপাইগুড়ি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অনন্তদেব অধিকারী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪২,৯৮৭
পরাজিত : কৃষ্ণ দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,১৮২
জয়ের ব্যবধান : ৬৮,৮০৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮— রাজগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : দীনেশ সরকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৬৫৭
পরাজিত : স্বপ্না বর্মণ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,১৮০
জয়ের ব্যবধান : ২১,৪৭৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯— ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি
জয়ী : শিখা চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৬৬,৩০০
পরাজিত : রঞ্জন শীল শর্মা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৮,৫৮৫
জয়ের ব্যবধান : ৯৭,৭১৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০— মাল (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : শুকরা মুণ্ডা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১২,০৯৫
পরাজিত : বুলু চিক বরাইক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,৬০৩
জয়ের ব্যবধান : ১৫,৪৯২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১— নাগরাকাটা (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : পুনা ভেংরা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৩,৪৭৮
পরাজিত : সঞ্জয় কুজুর (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,৬২০
জয়ের ব্যবধান : ২৫,৮৫৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২— কালিম্পং
জয়ী : ভরত কুমার ছেত্রী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৪,২৯০
পরাজিত : রুদেন সাদা লেপচা (ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা); প্রাপ্ত ভোট : ৬২,৮২৬, জয়ের ব্যবধান : ২১,৪৬৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩— দার্জিলিং
জয়ী : নোমান রাই (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬২,০৭৬
পরাজিত : বিজয়কুমার রাই (ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা); প্রাপ্ত ভোট : ৫৬,০১৯, জয়ের ব্যবধান : ৬,০৫৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪— কার্শিয়াং
জয়ী : সোনাম লামা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,৮৭৮
পরাজিত : অমর লামা (ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা); প্রাপ্ত ভোট : ৫৭,৮৭১, জয়ের ব্যবধান : ১৭,০০৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫— মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : আনন্দময় বর্মণ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৬৬,৯০৫
পরাজিত : শঙ্কর মালাকার (তৃণমূল কংগ্রেস);
প্রাপ্ত ভোট : ৬২,৬৪০, জয়ের ব্যবধান : ১,০৪,২৬৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬— শিলিগুড়ি
জয়ী : ড. শঙ্কর ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২০,৭৬০
পরাজিত : গৌতম দেব (তৃণমূল কংগ্রেস); প্রাপ্ত ভোট : ৪৭,৫৬৮
জয়ের ব্যবধান : ৭৩,১৯২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭— ফাঁসিদেওয়া (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : দুর্গা মুর্মু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৮,২৪১
পরাজিত : রীনা টোপ্পো এক্কা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭২,৯৭৮
জয়ের ব্যবধান : ৪৫,২৬৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮— চোপড়া
জয়ী : হামিদুল রহমান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২০,৯৮৬
পরাজিত : শঙ্কর অধিকারী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫১,৮৬২
জয়ের ব্যবধান : ৬৯,১২৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৯— ইসলামপুর
জয়ী : কানাইয়ালাল আগরওয়াল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,১১৭
পরাজিত : চিত্রজিৎ রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৮,০৫৪
জয়ের ব্যবধান : ৪০,০৬৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩০— গোয়ালপোখর
জয়ী : মহম্মদ গোলাম রব্বানি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২২,১০৫
পরাজিত : সরজিৎ বিশ্বাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৩৮,৩১৫
জয়ের ব্যবধান : ৮৩,৭৯০

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩১— চাকুলিয়া
জয়ী : আজাদ মিনহাজুল আরফিন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯০,২৭৭
পরাজিত : মনোজ কুমার জৈন (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬২,২৬৬
জয়ের ব্যবধান : ২৮,০১১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩২— করণদিঘি
জয়ী : বিরাজ বিশ্বাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,২৬০
পরাজিত : গৌতম পাল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,৩৯১
জয়ের ব্যবধান : ১৯,৮৬৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩৩— হেমতাবাদ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : হরিপদ বর্মণ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৫,৫২৯
পরাজিত : সত্যজিৎ বর্মণ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৩,১৬৮
জয়ের ব্যবধান : ১২,৩৬১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩৪— কালিয়াগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : উৎপল ব্রহ্মচারী মহারাজ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৫৮,৩৪৯
পরাজিত : নিতাই বৈশ্য (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৯২৪
জয়ের ব্যবধান : ৭৬,৪২৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩৫— রায়গঞ্জ
জয়ী : কৌশিক চৌধুরী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৫৬১
পরাজিত : কৃষ্ণ কল্যাণী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৪৬,৯২০
জয়ের ব্যবধান : ৫৮,৬৪১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩৬— ইটাহার
জয়ী : মোশারফ হোসেন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৮,১০২
পরাজিত : সবিতা বর্মণ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭০,২৯৪
জয়ের ব্যবধান : ২৭,৮৭৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩৭— কুশমণ্ডি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : তাপসচন্দ্র রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৭,৪৩৭
পরাজিত : রেখা রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৮,৩৭৪
জয়ের ব্যবধান : ৯,০৬৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩৮— কুমারগঞ্জ
জয়ী : তোরাফ হোসেন মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮২,৭৯১
পরাজিত : শুভেন্দু সরকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,১০৬
জয়ের ব্যবধান : ৬,৬৮৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ৩৯— বালুরঘাট
জয়ী : বিদ্যুৎ কুমার রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৬৯৭
পরাজিত : অর্পিতা ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৪৮,১২১
জয়ের ব্যবধান : ৪৭,৫৭৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪০— তপন (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : বুধরাই টুডু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৭৮০
পরাজিত : চিন্তামণি বিহা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৮,৭৯৩
জয়ের ব্যবধান : ৩৬,৯৮৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪১— গঙ্গারামপুর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সত্যেন্দ্রনাথ রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,০৮৩
পরাজিত : গৌতম দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,৭৪৪
জয়ের ব্যবধান : ২৮,৩৩৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪২— হরিরামপুর
জয়ী : বিপ্লব মিত্র (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,০৯৮
পরাজিত : দেবব্রত মজুমদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,১১২
জয়ের ব্যবধান : ১,৯৮৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪৩— হবিবপুর (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : জুয়েল মুর্মু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪২,০৬২
পরাজিত : অমল কিস্কু (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৩,৮৭৪
জয়ের ব্যবধান : ৭৮,১৮৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪৪— গাজোল (তপশিলি জাতি)
জয়ী : চিন্ময় দেব বর্মণ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩১,৫৪১
পরাজিত : প্রসেনজিৎ দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,৩৪৯
জয়ের ব্যবধান : ৩৮,১৯২

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪৫— চাঁচল
জয়ী : প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৮,০১৪
পরাজিত : রতন দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৪,১৪০
জয়ের ব্যবধান : ৬৩,৮৭৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪৬— হরিশ্চন্দ্রপুর
জয়ী : মহম্মদ মতিবুর রহমান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,১০৪
পরাজিত : রতন দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৪,৮৩৩
জয়ের ব্যবধান : ৪৮,২৭১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪৭— মালতীপুর
জয়ী : আবদুর রহিম বক্সি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,১২৩
পরাজিত : আশিস দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৪৩,৩৪৬
জয়ের ব্যবধান : ৬০,৭৭৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪৮— রতুয়া
জয়ী : সমর মুখোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৬,৮৩৪
পরাজিত : অভিষেক সিংঘানিয়া (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,২৭২
জয়ের ব্যবধান : ৩২,৫৬২

বিধানসভা কেন্দ্র : ৪৯— মানিকচক
জয়ী : গৌরচন্দ্র মণ্ডল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১০,১১৮
পরাজিত : কবিতা মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,১৮০
জয়ের ব্যবধান : ১৩,৯৩৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫০— মালদহ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : গোপালচন্দ্র সাহা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৩,৬৫৬
পরাজিত : লিপিকা বর্মণ ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,৫২৮
জয়ের ব্যবধান : ৫০,১২৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫১— ইংলিশ বাজার
জয়ী : অম্লান ভাদুড়ি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৫৪,০৯৬
পরাজিত : আশিস কুণ্ডু (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬০,৩১২
জয়ের ব্যবধান : ৯৩,৭৮৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫২— মোথাবাড়ি
জয়ী : মহম্মদ নজরুল ইসলাম (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৫,৭০৫
পরাজিত : নিবারণ ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫৫,২০৯
জয়ের ব্যবধান : ১০,৪৯৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫৩— সুজাপুর
জয়ী : সাবিনা ইয়াসমিন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১২,৭৯৫
পরাজিত : অভিজিৎ রজক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ২০,০৬৬
জয়ের ব্যবধান : ৯২,৭২৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫৪— বৈষ্ণবনগর
জয়ী : রাজু কর্মকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৬৯২
পরাজিত : চন্দনা সরকার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬১,৮১১
জয়ের ব্যবধান : ৪৬,৮৮১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫৫— ফরাক্কা
জয়ী : মোতাব শেখ (কংগ্রেস); প্রাপ্ত ভোট : ৬৩,০৫০
পরাজিত : সুনীল চৌধুরী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫৪,৮৫৭
জয়ের ব্যবধান : ৮,১৯৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫৬— সামশেরগঞ্জ
জয়ী : মহম্মদ নূর আলম (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬১,৯১৮
পরাজিত : ষষ্ঠীচরণ ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৩৪,৫২২
জয়ের ব্যবধান : ২৭,৩৯৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫৭— সূতি
জয়ী : ইমানি বিশ্বাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৩৩০
পরাজিত : মহাবীর ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৮,৯৭৩
জয়ের ব্যবধান : ১২,৩৫৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫৮— জঙ্গিপুর
জয়ী : চিত্ত মুখোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,২০১
পরাজিত : জাকির হোসেন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮০,৬৫৯
জয়ের ব্যবধান : ১০,৫৪২

বিধানসভা কেন্দ্র : ৫৯— রঘুনাথগঞ্জ
জয়ী : আখরুজ্জামান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৮,৯০৯
পরাজিত : সুরজিৎ পোদ্দার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৩৫,১৮৪
জয়ের ব্যবধান : ৫৩,৭২৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬০— সাগরদিঘি
জয়ী : বায়রন বিশ্বাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯০,৭৮১
পরাজিত : তাপস কুমার চক্রবর্তী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫৬,৫২১
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,২৬০

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬১— লালগোলা
জয়ী : ডাঃ আবদুল আজিজ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৭,৯৫৪
পরাজিত : অমর কুমার দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৩৫,৪৯৬
জয়ের ব্যবধান : ৩২,৪৫৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬২— ভগবানগোলা
জয়ী : রেয়াত হোসেন সরকার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৯৯৭
পরাজিত : ভাস্কর সরকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ২৩,১০৪
জয়ের ব্যবধান : ৮২,৮৯৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬৩— রানিনগর
জয়ী : জুলফিকার আলি (কংগ্রেস); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,৪২৩
পরাজিত : রাণাপ্রতাপ সিংহ রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ২২,৭২৮
জয়ের ব্যবধান : ৫৬,৬৯৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬৪— মুর্শিদাবাদ
জয়ী : গৌরীশঙ্কর ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৪৪৩
পরাজিত : শাওনী সিংহ রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮২,৯২২
জয়ের ব্যবধান : ৩১,৫২১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬৫— নবগ্রাম (তপশিলি জাতি)
জয়ী : দিলীপ সাহা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৭৩৯
পরাজিত : প্রণবচন্দ্র দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭২,৮২০
জয়ের ব্যবধান : ৫,৯১৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬৬— খড়গ্রাম (তপশিলি জাতি)
জয়ী : মিতালী মাল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,৭৪৮
পরাজিত : আশিস মারজিৎ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৮,৪১৫
জয়ের ব্যবধান : ৯,৩৩৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬৭— বড়ঞা
জয়ী : সুখেনকুমার বাগদি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,৬৬১
পরাজিত : প্রতিমা রজক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৯,৩৬১
জয়ের ব্যবধান : ২২,৩০০

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬৮— কান্দি
জয়ী : গার্গী দাস ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,৩৫৫
পরাজিত : অপূর্ব সরকার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৩,০২০
জয়ের ব্যবধান : ১০,৩৩৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ৬৯— ভরতপুর
জয়ী : মুস্তাফিজুর রহমান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯০,৮৭০
পরাজিত : অনামিকা ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬০,১১৭
জয়ের ব্যবধান : ৩০,৭৫৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭০— রেজিনগর
জয়ী : হুমায়ুন কবির (এজেইউপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৩,৫৩৬
পরাজিত : বাপন ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৪,৬৬০
জয়ের ব্যবধান : ৫৮,৮৭৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭১— বেলডাঙ্গা
জয়ী : ভরতকুমার ঝাওয়ার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭২,৮৭২
পরাজিত : রবিউল আলম চৌধুরী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৫৯,৬৬৪
জয়ের ব্যবধান : ১৩,২০৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭২— বহরমপুর
জয়ী : সুব্রত মৈত্র (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,০৮৮
পরাজিত : অধীররঞ্জন চৌধুরী (কংগ্রেস); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,৫৪০
জয়ের ব্যবধান : ১৭,৫৪৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭৩— হরিহরপাড়া
জয়ী : নিয়ামত শেখ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮০,৩৩৮
পরাজিত : তন্ময় বিশ্বাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৩২,০৫৭
জয়ের ব্যবধান : ৪৮,২৮১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭৪— নওদা
জয়ী : হুমায়ুন কবির (এজেইউপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,৪৬৩
পরাজিত : রাণা মণ্ডল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫৮,৫২০
জয়ের ব্যবধান : ২৭,৯৪৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭৫— ডোমকল
জয়ী : ম: মোস্তাফিজুর রহমান (সিপিআইএম); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,৮৮২
পরাজিত : নন্দদুলাল পাল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১৩,১৮০
জয়ের ব্যবধান : ৯৪,৭০২

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭৬— জলঙ্গি
জয়ী : বাবর আলি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৮,৬৮৪
পরাজিত : নবকুমার সরকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫১,৬৯৩
জয়ের ব্যবধান : ৩৬,৯৯১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭৭— করিমপুর
জয়ী : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,২৩৪
পরাজিত : সোহম চক্রবর্তী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,০৪৯
জয়ের ব্যবধান : ১০,১৮৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭৮— তেহট্ট
জয়ী : সুব্রত কবিরাজ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১২,১৩৮
পরাজিত : দিলীপ কুমার পোদ্দার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,৮৮৫
জয়ের ব্যবধান : ২৮,২৫৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৭৯— পলাশিপাড়া
জয়ী : রুকবানুর রহমান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৯,২৪১
পরাজিত : অনিমা দত্ত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,৭৮৭
জয়ের ব্যবধান : ১১,৪৫৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮০— কালীগঞ্জ
জয়ী : আলিফা আহমেদ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৯,২৯২
পরাজিত : বাপন ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,১২০
জয়ের ব্যবধান : ১০,১৭২

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮১— নাকাশিপাড়া
জয়ী : শান্তনু দে (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০০,৬০০
পরাজিত : কল্লোল খাঁ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,২৭৩
জয়ের ব্যবধান : ১৭,৩২৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮২— চাপড়া
জয়ী : জেবের শেখ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৭,০৮৫
পরাজিত : সৈকত সরকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৬,৩০৫
জয়ের ব্যবধান : ৩০,৭৮০

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮৩— কৃষ্ণনগর উত্তর
জয়ী : তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৩,২১১
পরাজিত : সোমনাথ দত্ত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৫৪,৮৫০
জয়ের ব্যবধান : ৭৮,৩৬১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮৪— নবদ্বীপ
জয়ী : শ্রুতিশেখর গোস্বামী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৬৩১
পরাজিত : পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,১৮৭
জয়ের ব্যবধান : ২১,৪৪৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮৫— কৃষ্ণনগর দক্ষিণ
জয়ী : সাধন ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০২,৮৬২
পরাজিত : উজ্জ্বল বিশ্বাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৫,০৬১
জয়ের ব্যবধান : ২৭,৮০১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮৬— শান্তিপুর
জয়ী : স্বপন কুমার দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৭,৯৪১
পরাজিত : ব্রজকিশোর গোস্বামী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭২,৫৬৫
জয়ের ব্যবধান : ৪৫,৩৭৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮৭— রাণাঘাট উত্তর-পশ্চিম
জয়ী : পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৯,০৪৬
পরাজিত : তাপস কুমার ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭১,৪৯৫
জয়ের ব্যবধান : ৫৭,৫৫১

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮৮— কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সুকান্ত বিশ্বাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৯,৮৩৮
পরাজিত : সমীরকুমার পোদ্দার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৯৩৯
জয়ের ব্যবধান : ৬০,৮৯৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ৮৯— রাণাঘাট উত্তর-পূর্ব (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অসীম বিশ্বাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৬,২৩৫
পরাজিত : বর্ণালী দে রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,৪৯২
জয়ের ব্যবধান : ৫১,৭৪৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯০— রাণাঘাট দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অসীমকুমার বিশ্বাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪০,০১০
পরাজিত : ডাঃ সৌগতকুমার বর্মণ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৫,৫৪৬
জয়ের ব্যবধান : ৬৪,৪৬৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯১— চাকদহ
জয়ী : বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৫,৪৩৩
পরাজিত : শুভঙ্কর সিংহ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৪৮৮
জয়ের ব্যবধান : ৩৬,৯৪৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯২— কল্যাণী (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অনুপম বিশ্বাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৪৬৯
পরাজিত : ডাঃ অতীন্দ্রনাথ মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,৬৭৭
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,৭৯২

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯৩— হরিণঘাটা (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অসীমকুমার সরকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,৯০০
পরাজিত : ডাঃ রাজীব বিশ্বাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৫,৮৪৫
জয়ের ব্যবধান : ২২,০৫৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯৪— বাগদহ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সোমা ঠাকুর (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২১,৩০৭
পরাজিত : মধুপর্ণা ঠাকুর (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,৬৯১
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,৬১৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯৫— বনগাঁ উত্তর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অশোক কীর্তনীয়া (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,৩১৭
পরাজিত : বিশ্বজিৎ দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৬৪৭
জয়ের ব্যবধান : ৪০,৬৭০

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯৬— বনগাঁ দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : স্বপন মজুমদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,৩৯৯
পরাজিত : ঋতুপর্ণা আঢ্য (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৫৮৫
জয়ের ব্যবধান : ৩৭,৮১৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯৭— গাইঘাটা (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সুব্রত ঠাকুর (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২১,৩২২
পরাজিত : নরোত্তম বিশ্বাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,৬৩৯
জয়ের ব্যবধান : ৪৭,৬৮৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯৮— স্বরূপনগর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : বীণা মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,৮১৩
পরাজিত : তারক সাহা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৭৯৬
জয়ের ব্যবধান : ১৬,০১৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ৯৯— বাদুড়িয়া
জয়ী : বুরহানুল মুকাদ্দিম (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৩,৩৩৪
পরাজিত : সুকৃতি কুমার সরকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৩,২৭৩
জয়ের ব্যবধান : ৪০,০৬১

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০০— হাবরা
জয়ী : দেবদাস মণ্ডল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৬৪৫
পরাজিত : জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,১৮৩
জয়ের ব্যবধান : ৩১,৪৬২

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০১— অশোকনগর
জয়ী : ডাঃ সুময় হীরা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,৮০৭
পরাজিত : নারায়ণ গোস্বামী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,৩৯৯
জয়ের ব্যবধান : ৯,৪০৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০২— আমডাঙ্গা
জয়ী : মহম্মদ কাসেম সিদ্দিকি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৬৭০
পরাজিত : অরিন্দম দে (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৬৭৫
জয়ের ব্যবধান : ২,৯৯৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০৩— বীজপুর
জয়ী : সুদীপ্ত দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭১,৭৯৯
পরাজিত : সুবোধ অধিকারী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৫৮,৪৫৬
জয়ের ব্যবধান : ১৩,৩৪৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০৪— নৈহাটি
জয়ী : সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,৪৮৪
পরাজিত : সনৎ দে (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৭,০৫৪
জয়ের ব্যবধান : ১০,৪৩০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০৫— ভাটপাড়া
জয়ী : পবনকুমার সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬১,৬৮৩
পরাজিত : অমিত গুপ্তা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৩৮,৮৭৬
জয়ের ব্যবধান : ২২,৮০৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০৬— জগদ্দল
জয়ী : ড. রাজেশ কুমার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,৩৫১
পরাজিত : সোমনাথ শ্যাম (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,৪৪২
জয়ের ব্যবধান : ২০,৯০৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০৭— নোয়াপাড়া
জয়ী : অর্জুন সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,৪১৫
পরাজিত : তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,৭৫৯
জয়ের ব্যবধান : ১৭,৬৫৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০৮— ব্যারাকপুর
জয়ী : কৌস্তভ বাগচী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৪৬৬
পরাজিত : রাজ চক্রবর্তী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬২,৬৪৪
জয়ের ব্যবধান : ১৫,৮২২

বিধানসভা কেন্দ্র : ১০৯— খড়দহ
জয়ী : ড. কল্যাণ চক্রবর্তী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৭,৭৫২
পরাজিত : দেবদীপ পুরোহিত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,২৬৬
জয়ের ব্যবধান : ২৪,৪৮৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১০— দমদম উত্তর
জয়ী : সৌরভ শিকদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৩,২৮৪
পরাজিত : চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,৮৮০
জয়ের ব্যবধান : ২৬,৪০৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১১— পানিহাটি
জয়ী : রত্না দেবনাথ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,৯৭৭
পরাজিত : তীর্থঙ্কর ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৫৯,১৪১
জয়ের ব্যবধান : ২৮,৮৩৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১২— কামারহাটি
জয়ী : মদন মিত্র (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৪,৮১৭
পরাজিত : অরূপ চৌধুরী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫৯,১৭১
জয়ের ব্যবধান : ৫,৬৪৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১৩— বরানগর
জয়ী : সজল ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৭৩০
পরাজিত : সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৪,৭৭৪
জয়ের ব্যবধান : ১৬,৯৫৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১৪— দমদম
জয়ী : অরিজিৎ বক্সি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৯,১৮১
পরাজিত : ব্রাত্যব্রত বসু (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,৯০৮
জয়ের ব্যবধান : ২৫,২৭৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১৫— রাজারহাট-নিউটাউন
জয়ী : পীযূষ কানোরিয়া (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৬,৫৬৪
পরাজিত : তাপস চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৬,২৪৮
জয়ের ব্যবধান : ৩১৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১৬— বিধাননগর
জয়ী : ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৭,৯৮৯
পরাজিত : সুজিত বসু (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬০,৬৪৯
জয়ের ব্যবধান : ৩৭,৩৩০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১৭— রাজারহাট-গোপালপুর
জয়ী : তরুণজ্যোতি তিওয়ারি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০১,২৭৭
পরাজিত : অদিতি মুন্সি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,৫২০
জয়ের ব্যবধান : ২৭,৭৫৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১৮— মধ্যমগ্রাম
জয়ী : রথীন ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৯৯৫
পরাজিত : অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,৫৯৬
জয়ের ব্যবধান : ২,৩৯৯

(ক্রমশঃ)

বিস্মৃতপ্রায় বঙ্গের প্রথম সম্রাজ্ঞী
রানি ভবানী

জীতেন্দ্র নাথ ঘোষ

ইতিহাস হলো মানবজাতির অতীতের গৌরবময় ঘটনাগুলোর সুসংবদ্ধ, বিশ্লেষণাত্মক, সমাজ, সভ্যতার বিকাশ ও পরিবর্তনের তথ্যনির্ভর অধ্যয়ন, যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মে উন্নত করার পথপ্রদর্শক। আমাদের নিজস্ব জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস পাঠকরা দরকার। একটা জাতির উত্থান ঘটে ঐতিহাসিক আত্মবোধের দ্বারা। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্যগত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে পাঠ্যসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গের প্রথম সম্রাজ্ঞী রানি ভবানীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস মহাকালের ধুলোয় ঢাকা এক অধ্যায়।

ইতিহাসে বিস্মৃত এক দীপশিখা নাটোরের মহারানি— রানি ভবানী। রানি ভবানী ছিলেন বঙ্গের অত্যন্ত প্রভাবশালী জমিদার ও সমাজসেবী। তাঁর কর্মকাণ্ডের কোনো ভৌগোলিক সীমা-পরিসীমা ছিল না, ছিল না কোনো সংকীর্ণতা, কোনো আত্মপ্রচারের অভিপ্রায়। তৎকালীন বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিপর্যস্ত রাজনৈতিক পটভূমিতে তাঁর কাঁধে অর্পিত হয়েছিল জমিদারির দায়িত্ব। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্ব নবাবের অসহযোগিতা ও লোলুপ দৃষ্টি, পরবর্তীতে ইংরেজ রাজশক্তির সুচতুর ষড়যন্ত্রের চরমতম প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দৃঢ় হস্তে জমিদারিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুশাসন। প্রজাহিতৈষী রানি ভবানী রাজঐশ্বর্য ত্যাগ করে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পানীয় জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, কৃষির উন্নয়ন, দান-ধ্যান, ধর্মীয় ও সামাজিক কাজের মাধ্যমে হয়ে উঠেছিলেন মানব কল্যাণের এক উজ্জ্বলতম জীবন্ত প্রতীক, নিঃস্বার্থ সমাজ সংস্কারক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মেয়েদের স্থান ছিল অন্দরমহলে, সেই সময় রানি ভবানী বিরাজ করেছেন মর্যাদার সঙ্গে। প্রজাহিতৈষী কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রজারা তাঁকে 'মহারানি' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

বঙ্গের ইতিহাসে যে কয়েকজন মমতাময়ী, তেজোদ্দীপ্তা, বিদুষী নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে রানি ভবানী ছিলেন নিঃসন্দেহে অন্যতম।

পূর্ববঙ্গের বগুড়া জেলার ছাতিয়ান গ্রামে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে জমিদার আত্মারাম চৌধুরী ও তমাদেবীর গৃহে এক জ্যোতির্ময়ী শিশুকন্যা আবির্ভূতা হন। পিতা-মাতা নাম রাখেন ভবানী। বাল্যকাল থেকেই ভবানী ছিলেন শান্ত, ধীর, স্থির, বুদ্ধিমতী ও ধার্মিক। কৈশোরে ঈশ্বর ভক্তি ও চরিত্রগঠনই ছিল তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি। সদানন্দময়ী হাস্যোজ্জ্বল ভবানী ছিলেন রূপবতী। শৈশবের কোমলতা থেকে দায়িত্বশীল কৈশোরে পদার্পণ করে তিনি বিদুষী হিসেবে সুপরিচিতা হয়ে ওঠেন। নাটোরের জমিদার রামজীবন রায়ের বিশ্বস্ত দেওয়ান দয়ারাম রায়ের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় বাল্যকালেই জমিদার রামজীবনের দত্তকপুত্র রামকান্ত রায়ের সঙ্গে ভবানী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৭৩৪ সালে জমিদার রামজীবন রায়ের মৃত্যুর পর রামকান্ত মাত্র আঠারো বছর বয়সে নাটোরের জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রামকান্ত প্রশাসনিক বিষয়ে উদাসীন থাকায় প্রশাসনিক দায়িত্ব দেখভাল করতেন বিশ্বস্ত দেওয়ান দয়ারাম রায়। ভবানী পরোক্ষ ভাবে দয়ারামকে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করতেন। বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শী ভবানীর পরামর্শে দয়ারাম বিশাল জমিদারি পরিচালনা করে শ্রীবৃদ্ধি করেন। ধীরে ধীরে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, বুদ্ধিমতী ভবানী জমিদারি পরিচালনার কাজে দক্ষতা অর্জন করেন। ভবানীর তিন সন্তানের মধ্যে দুই পুত্রসন্তানের বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী জীবিত ছিলেন। ১৭৪৮ সালে ভবানীর স্বামী রামকান্ত অকালে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ভবানী বিশাল জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে একজন নারীর জমিদার হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়া ছিল যুগান্তকারী ও বিরল দৃষ্টান্ত, কিন্তু ভবানী ৩২ বছর বয়সে রানি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ জমিদারি পাঁচ দশকের অধিক কাল দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত নাটোর ছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তর জমিদারি। নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, যশোর, রংপুর এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহ পর্যন্ত ১৬৪টি পরগনা রানির জমিদারির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভূমির পরিমাণ ছিল ৩২,৯৭০ বর্গ কিলোমিটার (১২,৭৪১ বর্গ মাইল) বিস্তৃত। হলওয়েলের লেখা থেকে জানা যায় জমিদারির বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি টাকা। নবাবকে বার্ষিক রাজস্ব দিতে হতো ৭০ লক্ষ টাকা।

দূরদর্শী রানি ভবানী উপলব্ধি করেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে কোনো সময় নাটোর আক্রমণ করতে পারেন। নবাব সিরাজের আক্রমণ থেকে জমিদারকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করেন। সেনাবাহিনীর সংস্কার ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাহিনীকে শক্তিশালী করেন। দুশ্চরিত্র নবাব সিরাজ লালসা মেটানোর জন্য রানিমার পরমা সুন্দরী কন্যা তারাসুন্দরীকে দাবি করে দূত প্রেরণ করেন। রানিমা নবাবের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে দূতকে বিতাড়িত করেন। ক্ষুব্ধ নবাব সিরাজ রানিমাকে পদচ্যুত করে রাজকোষ লুণ্ঠন এবং তারাসুন্দরীকে অপহরণ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে নাটোরের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন। রানিমা নিজে দেবী দুর্গার মতো ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে নাটোরের জনগণের সাহায্যে নবাবের বাহিনীকে পরাজিত করে নাটোর থেকে বিতাড়িত করেন এবং নবাবকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার জীবদ্দশায় রানিমার কোনো ক্ষতি করতে পারেননি।

দান, মানবতা, আত্মসম্মান ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অসাধারণ সংমিশ্রণ ছিলেন রানি ভবানী। তাঁর জীবন শুধু নাটোরের রাজবাড়ির গৌরব নয়, সমগ্র বঙ্গের নারীত্বের, সমাজ সেবার ও সংস্কৃতির এক দীপ্ত অধ্যায়। অবিভক্ত বঙ্গ থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর অবদানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অবদান এত বিস্তৃত ছিল যে তার সম্পূর্ণ তালিকা আজও অনাবিষ্কৃত। তাঁর দান কেবল রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমাজের প্রান্তিক মানুষ থেকে অসহায় পরিবার সকলের আশ্রয় ও অবলম্বন ছিলেন।

১১৭৬ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ১৭৭০ সাল) বঙ্গের ইতিহাসে ঘোর অন্ধকার অধ্যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্মম শোষণের যৌথ ফল ভয়ঙ্কর 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। অনাবৃষ্টি, কোম্পানির দ্বৈত শাসন, অত্যধিক ভূমিরাজস্ব আদায়, খাদ্য শস্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির ফলে খাদ্যের অভাবে সমগ্র বঙ্গজুড়ে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার আর মৃত্যুর মিছিল। এই বিভীষিকাময় দুর্দিনে সমাজের বিত্তশালী মানুষ, ব্রিটিশ কর্মচারী, ব্যবসায়ীরা কালোবাজারির মাধ্যমে মুনাফা লাভ করে আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন। মানুষের এই চরম দুর্দিনে ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য রানি ভবানী অন্নপূর্ণা রূপে তাঁর জমিদারির ১৬৪টি পরগনায় অন্নছত্র খুলে খাদ্যের ব্যবস্থা করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন। প্রজাদের খাজনা মকুব করে কৃষির উন্নয়নের জন্য তাঁর সঞ্চিত খাদ্যশস্য, কোষাগারের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছিলেন বুবুক্ষ মানুষদের মধ্য। প্রজাদের চিকিৎসার জন্য আটজন বৈদ্য নিয়োগ করেছিলেন। এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গের প্রায় এক কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু নাটোরের প্রজারা রক্ষা পেয়েছিলেন তাদের মহারানির জন্য। প্রজাদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা।

একজন সদর্থক, দূরদর্শী, সমাজ সচেতন মানুষের দ্বারা সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ কীভাবে আলোকিত হতে পারে তার উজ্জ্বলতম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হলেন রানি ভবানী। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের শেখায় দায়িত্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের। অষ্টাদশ শতকে শিক্ষা যখন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতি

গঠনের প্রধান শর্ত হলো শিক্ষা। এই উপলব্ধি থেকে তিনি অকাতরে জমি ও অর্থ দান করে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকে বঙ্গের নারীজীবন শিক্ষার আলো থেকে প্রায় বঞ্চিত ছিল। তিনি সেই অন্ধকারে বঙ্গনারীদের জীবনে আলোর দীপশিখা প্রজ্বলিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রজাদের জলের সংকট দূর করার জন্য ৩৬০টি দীঘি ও পুকুর খনন করেন। সার্ভেয়ার ম্যালি বলেছেন— 'রানি ভবানী ৩৮০টি অতিথিনিবাস ও পান্থশালা নির্মাণ করেন। যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করার জন্য শত শত রাস্তা নির্মাণ করেন। বঙ্গের মানুষদের কাশীধাম দর্শনের সুবিধার জন্য হাওড়া থেকে কাশীধাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেন, যা রানি ভবানী রোড বা বেনারস রোড নামে খ্যাত ছিল। বর্তমানে এটি মুম্বই রোডের অংশ। উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করে রেলপথ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন বঙ্গের রূপকার।

অনাড়ম্বর জীবনযাপনের সঙ্গে তাঁর উদার, সমাজহিতৈষী, ধর্মপ্রাণ মনোভাবের জন্য তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগ্রত করার জন্য তিনি বঙ্গে ৩০০শো-র বেশি মন্দির নির্মাণ করেন। ১৭৫৩ সালে উত্তরপ্রদেশের কাশীর ভবানীশ্বর শিব মন্দিরের সংস্কার, দুর্গাবাড়ি দুর্গকুণ্ড, কুরুক্ষেত্রতলা জলাশয় স্থাপন করেন। বীরভূমের তারাপীঠেও জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করে স্থাপত্যের বর্তমান রূপ দেন। তারামাতার নিত্য পূজা ও নিত্য ভোগের ব্যবস্থার জন্য অর্থ ও জমি দান করেন। অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার ভবানীপুরের প্রাচীন শক্তিপীঠের জরাজীর্ণ মন্দির সংস্কার করে সুরক্ষার জন্য বারো বিঘা এলাকা জুড়ে মন্দিরের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করেন।

পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে দীঘি ও পুকুর খনন করেন এবং 'ভবানী মন্দির' নামক বারোদুয়ারি বৃহত্তম বিশ্রামশালা নির্মাণ করেন। নিত্য পূজা, ভোগ, মাঘীপূর্ণিমা-সহ বিভিন্ন উৎসবের সুব্যবস্থার জন্য জমি ও অর্থ দান করেন। ভবানীপুর সতীপীঠকে তিনি পূর্ণাঙ্গ তীর্থক্ষেত্রের রূপ দান করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী-গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত রানি ভবানীর স্মৃতি ও কীর্তি বিজড়িত প্রাচীন গঞ্জ বড়নগর। রানিমা বড়নগরকে দ্বিতীয় বারাণসীরূপে গড়ে তোলার জন্য ১৭৫৩ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত ১০৮টি শিব মন্দির নির্মাণ করেন। পোড়ামাটির অসাধারণ কারুকার্য সমন্বিত মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো চারটি একচালা বাংলা-মন্দির, যা 'চার বাংলা' নামে খ্যাত, টেরাকোটার কারুকার্য সমন্বিত স্থাপত্য শৈলীর অসাধারণ নিদর্শন। চার বাংলা মন্দিরের পাশে অবস্থিত অষ্টকোণ মন্দিরের চূড়াগুলি উল্টানো পদ্মসদৃশ্য। এর মধ্যে বিখ্যাত ভবানীশ্বর মন্দির সর্ব বৃহত্তম। মন্দিরগাত্রে অপূর্ব ভাস্কর্য সমন্বিত রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিকার, শোভাযাত্রা, অসুরনাশিনী চণ্ডী, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কংস বধ, কালী-সহ বহু দেব-দেবীর টেরাকোটার মূর্তি আজও দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে। স্থানটিকে ২০২৪ সালে ভারতের পর্যটন দপ্তর শ্রেষ্ঠ পর্যটন গ্রামের স্বীকৃতি দিয়েছে।

রানি ভবানী একা হাতে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও পঞ্চাশ বছর দক্ষতা ও মর্যাদার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করে ১৮০২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

একজন আদর্শ জমিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াইয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন চরিত্রবল, মূল্যবোধ, দৃঢ় মানসিকতা, উদার মানবিকতা নেতৃত্বের মূল ভিত্তি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই বিদুষী নারীশক্তির ইতিহাসে যার নাম উজ্জ্বল হয়ে ওঠার কথা তিনি ইতিহাসে বিস্মৃত উপেক্ষিত। বর্তমান সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক দায়িত্ববোধ মানব কল্যাণে তাঁর ইতিহাস কেবল অতীতের গৌরবগাথা নয়, সামাজিক চেতনার মূল মন্ত্র। রানি ভবানী এমন এক আলোকবর্তিকা যার দীপ্ত ইতিহাসের ধূলোয় আচ্ছন্ন হলেও নিভে যায়নি। যুগের দাবি সেই আলোকবর্তিকাকে নতুন করে আবিষ্কার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

ত্রিপুরা রাজাদের অকৃপণ অবদানে গড়া কুমিল্লার ইতিহাস ও সংস্কৃতি

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

পূর্ববঙ্গের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের এক অনন্য সংস্কৃতি-ধন্য কুমিল্লা। আদি নাম ত্রিপুরা। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে এর নিবিড় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, ৯ম শতাব্দীতে কুমিল্লা হরিকেল রাজাবংশের অধীনে আসে এবং পরবর্তীকালে এটি হয়ে ওঠে প্রাচীন বঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র। কুমিল্লা শহরের পশ্চিম- দক্ষিণে অবস্থিত লালমাই-ময়নামতি অঞ্চল প্রাচীন সভ্যতার এক জীবন্ত নিদর্শন, যেখানে ৮ম শতাব্দীতে দেববংশ এবং দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে চন্দ্রবংশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এই অঞ্চলজুড়ে গড়ে ওঠা অসংখ্য বিহার, স্তূপ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন আজও সেই গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে।

এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা রাজ পরিবারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা দীর্ঘ সময় ধরে ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের প্রভাবাধীন ছিল। মাণিক্য বংশের শাসকরা শুধু প্রশাসনিক কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং এ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের শাসনামলে কৃষি, বাণিজ্য এবং সনাতন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। ত্রিপুরা রাজারা কুমিল্লা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সড়ক যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনামলেও ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী যদিও বর্তমান ভারতের অন্তর্গত, তবুও কুমিল্লা ছিল তাদের প্রভাব বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

মধ্যযুগ অতিক্রম করে ঔপনিবেশিক যুগে প্রবেশ করলে কুমিল্লার প্রশাসনিক কাঠামোতে বড়ো পরিবর্তন আসে। ১৭৬৫ সালে এই অঞ্চল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে, যা উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পরবর্তীতে ১৭৯০ সালে কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবেড়িয়াকে একত্র করে 'ত্রিপুরা' জেলা গঠন করা হয়। দীর্ঘদিন এই নামেই অঞ্চলটি পরিচিত থাকলেও ১৯৬০ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জেলার নাম পরিবর্তন করে কুমিল্লা রাখা হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবেড়িয়া পৃথক জেলায় উন্নীত হলে কুমিল্লা তার বর্তমান প্রশাসনিক সীমানা লাভ করে।

কুমিল্লার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর নদ-নদী, যা এ অঞ্চলের অর্থনীতি, কৃষি ও জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। গোমতী নদী এই জেলার প্রধান নদী। এর পাশাপাশি সালদা ও কাঁকড়ি নদীও উল্লেখযোগ্য। এই নদীগুলোর উৎপত্তি

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে। গোমতী নদী কুমিল্লার দাউদকান্দিতে মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে, কাঁকড়ি নদী চৌদ্দগ্রামে ছোটো ফেনী নদীতে মিশেছে এবং সালদা নদী ব্রাহ্মণপাড়া অতিক্রম করে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার কসবা এলাকায় বুড়ি নদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই নদীগুলো একদিকে যেমন জমির উর্বরতা এনে দিয়েছে, অন্যদিকে বন্যা ও ভাঙনের মাধ্যমে মানুষের জীবনে দুর্ভোগও ডেকে এনেছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে কুমিল্লা পূর্ববঙ্গের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল। শালবন বিহার, যা ভবদেব কর্তৃক নির্মিত, প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এর পাশাপাশি আনন্দ বা ভোজ বিহার, কুটিল মুড়া, রূপবানের ইটাখোলা ও ময়নামতির বিস্তৃত প্রত্নাঞ্চল ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর শিল্প, স্থাপত্য ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিফলন বহন করে। লালমাই পাহাড় ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং একই সঙ্গে এটি প্রাচীন বসতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। আধুনিক কুমিল্লা শুধু ইতিহাসেই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোটবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত RARD (Rural Academy for Rural Development) প্রতিষ্ঠানটি, যার প্রতিষ্ঠাতা Akhtar Hameed Khan, গ্রামীণ উন্নয়ন ও গবেষণায় বিশেষ অবদান রেখেছে। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িও এই জেলায় অবস্থিত, যা জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কুমিল্লায় আবিষ্কৃত পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র— বাখরাবাদ, বাঙ্গুরা, লালমাই, শ্রীকাইল ও শ্রীকাইল পূর্ব-১— দেশের জ্বালানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়া বিবির বাজার স্থলবন্দর দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। এই অঞ্চলে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস কুমিল্লার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চণ্ডী মন্দির বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কুমিল্লা অঞ্চলের লালমাই-ময়নামতি পাহাড়শ্রেণী বহু শতাব্দী ধরে নানা সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে আছে, আর সেই ধারাবাহিকতার মধ্যেই চণ্ডী মন্দির একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। লালমাই পাহাড় মূলত একটি দীর্ঘ পাহাড়শ্রেণী, বহু শতাব্দী ধরে নানা সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে আছে, আর সেই ধারাবাহিকতার মধ্যেই চণ্ডী মন্দির একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। লালমাই পাহাড় মূলত একটি দীর্ঘ পাহাড়শ্রেণী, যা কুমিল্লা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলটি প্রাচীন সমতট জনপদের অন্তর্গত ছিল এবং ইতিহাসবিদদের মতে, এখানে খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ মতের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সেই সময় অসংখ্য বিহার, স্তূপ ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তবে পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্মের প্রভাবও এই অঞ্চলে সুদৃঢ় হয়।

এই দ্বৈত ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখা যায় চণ্ডী মন্দিরের অবস্থান ও গুরুত্বে। চণ্ডী মন্দিরটি দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যিনি হিন্দু ধর্মশক্তির প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। দেবী চণ্ডী মূলত দুর্গার এক রূপ, যিনি অসুরবিনাশিনী এবং ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। স্থানীয় জনগণের কাছে এই মন্দির শুধু পূজার স্থান নয়, বরং আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল হিসেবেও বিবেচিত। বহু ভক্ত এখানে মানত করেন, পূজা দেন এবং জীবনের নানা সংকট থেকে মুক্তির আশায় প্রার্থনা করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই মন্দিরের নির্দিষ্ট নির্মাণকাল নির্ধারণ করা কঠিন হলেও ধারণা করা হয় এটি প্রাচীন কোনো ধর্মীয় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত বা পুনর্নির্মিত হয়েছে। লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই এলাকা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ফলে চণ্ডী মন্দিরও সেই বৃহত্তর ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও লালমাই পাহাড় অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সবুজে ঘেরা টিলা, নীরব পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনের সমন্বয়ে এই স্থানটি দর্শনার্থীদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

চণ্ডী মন্দিরের আশপাশে দাঁড়িয়ে পুরো এলাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়, যা একদিকে যেমন মানসিক প্রশান্তি দেয়, অন্যদিকে ইতিহাসের গভীরতায় ডুব দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। ধর্মীয় উৎসবের সময়, বিশেষ করে দুর্গাপূজা বা কালীপূজার সময়, এই মন্দির এলাকায় ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয়ভাবে নানা আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, যা এই অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতিরও পরিচায়ক। মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বর্তমানে চণ্ডী মন্দির ও লালমাই পাহাড়ের অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে এই অঞ্চলের ইতিহাসকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব। পাশাপাশি, পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে এই স্থানটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও পরিচিতি লাভ করতে পারে। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চণ্ডী মন্দির শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় স্থান নয়; এটি ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের এক জীবন্ত প্রতীক। অতীতের ঐতিহ্য এবং বর্তমানের আধ্যাত্মিক চর্চা— দুটিরই মিলনস্থল হিসেবে এই মন্দির আজও মানুষের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

কুমিল্লা শহর ও এর আশপাশের অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এই অঞ্চলে আজও ছড়িয়ে- ছিটিয়ে রয়েছে ত্রিপুরা রাজবংশের শাসনামলের বহু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, যা ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল্যবান সাক্ষ্য বহন করে। কুমিল্লা

অঞ্চলের লালমাই-ময়নামতি পাহাড়শ্রেণী প্রাচীন সমতট জনপদের অন্তর্গত ছিল এবং পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রাজাদের অধীনে আসে। মহারাজা ধর্ম মাণিক্য-সহ ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় রাজারা এই অঞ্চলে তাদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেন। ফলে কুমিল্লা শুধু একটি ভৌগোলিক এলাকা নয়, বরং ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে শালবন বিহার, যা মূলত একটি বৌদ্ধ বিহার হলেও এর আবিষ্কার ও সংরক্ষণে ত্রিপুরা রাজাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ময়নামতি অঞ্চলের অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা— স্তূপ, মঠ ও প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ— ত্রিপুরা রাজাদের শাসনামলের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত। ত্রিপুরা রাজারা কুমিল্লা অঞ্চলে শুধু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণই প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। হিন্দু ধর্মের মন্দির নির্মাণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে তাদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চণ্ডী মন্দির সেই ঐতিহ্যেরই একটি প্রতিফলন।

এছাড়াও কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন স্থানে, এমনকী গ্রামীণ এলাকাতেও ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন ইটের গঠন, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্ন, যা ত্রিপুরা রাজাদের দীর্ঘ শাসনকাল ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। এই নিদর্শনগুলো আজও গবেষক, ইতিহাসবিদ ও পর্যটকদের জন্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কুমিল্লা শহর কেবল একটি আধুনিক নগরী নয়; এটি ত্রিপুরা রাজাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের এক জীবন্ত ভাণ্ডার। এই নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে আমাদের অতীতকে আরও গভীরভাবে জানা সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তুলে ধরা যাবে। কুমিল্লা শহর শুধু একটি প্রশাসনিক বা আধুনিক নগরী নয়— এটি ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ত্রিপুরা রাজবংশের স্মৃতিতে গড়া এক জীবন্ত ঐতিহ্যের ভাণ্ডার। শহরের বিভিন্ন স্থানে আজও ছড়িয়ে রয়েছে সেই অতীতের স্পষ্ট চিহ্ন, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রানির দীঘি ও বীরচন্দ্র পাঠাগার। রানির দীঘি রাজকীয় ঐতিহ্যের জলাধার। কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রানির দীঘি একটি ঐতিহাসিক জলাধার, যা ত্রিপুরার রাজপরিবারের স্মৃতিবাহী। ধারণা করা হয়, এটি ত্রিপুরার কোনো রানির উদ্যোগে খনন করা হয়েছিল— সেই থেকেই এর নাম 'রানির দীঘি'। শুধু জলের আধার হিসেবেই নয়, এটি ছিল রাজপরিবারের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। বর্তমানে রানির দীঘি শহরের সৌন্দর্য ও বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র। চারপাশে গড়ে উঠেছে পার্ক, বসার জায়গা ও হাঁটার পথ। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এখানে বিশ্রাম নিতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং ইতিহাসের ছোঁয়া অনুভব করতে আসেন।

বীরচন্দ্র পাঠাগার কুমিল্লার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগার, যা ত্রিপুরার প্রখ্যাত শাসক মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন সংস্কৃতি ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁর শাসনামলে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়েছিল। এই পাঠাগারটি কেবল বই পড়ার স্থান নয়; এটি কুমিল্লার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। বহু প্রজন্ম ধরে শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাহিত্যপ্রেমীরা এখানে এসে জ্ঞান আহরণ করেছেন। কুমিল্লা শহরের এসব নিদর্শন প্রমাণ করে যে, ত্রিপুরা রাজবংশ শুধু রাজনৈতিক শাসনই করেনি, বরং জনকল্যাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রানির দীঘির মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং বীরচন্দ্র পাঠাগারের মতো জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান সেই ইতিহাসের উজ্জ্বল উদাহরণ। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন স্থাপন, মন্দির ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। কুমিল্লা তাই একদিকে যেমন ইতিহাসের শহর, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতি ও শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

সবশেষে বলা যায়, রানির দীঘি ও বীরচন্দ্র পাঠাগার কেবল স্থাপনা নয়— এগুলো কুমিল্লার অতীতের গৌরব, ত্রিপুরা রাজাদের অবদান এবং মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

বর্তমান বিশ্বে ইতিহাস, ভূগোল ও সমসাময়িক ঘটনাবলী গভীরভাবে বুঝতে মানচিত্র জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই Mississippi Publications প্রকাশ করেছে 'মানচিত্রে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ' এবং 'মানচিত্রে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ' শীর্ষক দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 'মানচিত্রে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ' বইটিতে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মানচিত্র-সহ বিস্তারিত বর্ণনা, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাসভিত্তিক মানচিত্র এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য উপযোগী প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। অন্যদিকে 'মানচিত্রে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ' গ্রন্থে ১৯৪টি দেশ ও ৭টি মহাদেশের মানচিত্রের পাশাপাশি বিশ্ব ভূগোলের বিভিন্ন উপাদান— সমুদ্র, প্রণালী, পর্বত, নদী, মরুভূমি ও জলপ্রপাত— সম্পর্কিত তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপন রয়েছে, যা শিক্ষার্থী এবং চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

সব মিলিয়ে কুমিল্লা একদিকে যেমন প্রাচীন সভ্যতার ধারক, তেমনি ত্রিপুরা রাজ পরিবারের ঐতিহাসিক প্রভাব, ঔপনিবেশিক পরিবর্তন, সমৃদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব এবং আধুনিক উন্নয়নের সমন্বয়ে এক অনন্য অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ইতিহাস, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের অতীতকে বুঝতে সাহায্য করে, আর মানচিত্রভিত্তিক জ্ঞান সেই উপলব্ধিকে আরও সুসংহত ও গভীর করে তোলে। □

এই নির্বাচনে শুধু বিজেপির জয় নয়, দেশের সুরক্ষা ও সত্যের জয়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

চার রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে মে মাসের চার তারিখ। রাজ্যগুলো হলো--- পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরলম, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল পুদুচেরি। এই নির্বাচনে গোটা দেশের নজর ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের দিকে। কারণ এই দুই রাজ্যের ফলের ওপর জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি-র গুরুত্ব নির্ভর করছিল। অবশেষে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়ছে বিজেপি। অন্যদিকে অসমে হ্যাটট্রিক করেছে বিজেপি। অর্থাৎ পরপর তিনবার সেখানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করল।

ভোটের ফলাফল যা হয়েছে তা হলো— পশ্চিমবঙ্গে মোট আসন সংখ্যা ২৯৪টি। ভোট হয়েছে ২৯৩টিতে। বিজেপি জিতেছে-২০৭, তৃণমূল-৮০, বামজোট-২, কংগ্রেস-২ ও এজেইউপি পেয়েছে ২টি আসন।

অসমে মোট আসন-১২৬। বিজেপি -১০১, কংগ্রেস-২২, এআইইউডিএফ-৩ এবং অন্যান্য-০।

তামিলনাড়ুতে মোট আসন-২৩৪। টিভিকে-১০৮, ডিএমকে-৭৫, এবং অন্যান্য-০।

কেরলমে মোট আসন-১৪০। ইউডিএফ-৯৯, এলডিএফ-৩৫, এনডিএ -৩, অন্যান্য-৩।

পুদুচেরিতে মোট আসন-৩০। এনডিএ -১৮, কংগ্রেস-৬, অন্যান্য-৬টি।

এবারের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আর পাঁচটা রাজ্যের নির্বাচনের মতো ছিল না।

এই জয় সনাতনী হিন্দুদের জয়। এই জয় পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারিত বাঙ্গালি হিন্দুদের জয়, এই জয় হিন্দুদের ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার জয়। এই জয় রাজ্যের হিন্দু বাঙ্গালিদের বেঁচে থাকার জয়, এই জয় ভারতের সুরক্ষার জয়।

কারণ, ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি মিলে অখণ্ড ভারতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চেয়েছিল এবং বঙ্গ ও পঞ্জাব প্রদেশকে মুসলিম লিগের পাকিস্তানের হাতে তুলে দিচ্ছিল। কিন্তু সেদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ ও পঞ্জাবকে ভাগ করে হিন্দু বাঙ্গালি এবং হিন্দু পঞ্জাবিকে দিয়েছিলেন তাঁদের পরিচিতি। পাকিস্তানি হায়েনাদের মুখ থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পঞ্জাবকে ছিনিয়ে এনে বাঙ্গালি হিন্দুদের এবং পঞ্জাবি হিন্দুদের ভারতীয় পরিচয় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিগত ৩৪ বছরের বাম ও ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনে এই দুটি দল শুধুমাত্র বাঙ্গালি হিন্দুর আবাসভূমি এই পশ্চিমবঙ্গকে জেহাদি, অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে তুলেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ১৫ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গকে মুঘল শাসনে পরিণত করে রেখেছিল। এখানে ছিল মুঘল বাদশা বাবর, আকবর, জাহাঙ্গির, হুমায়ুন, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবরা। একেবারে পাক্কা মুঘল শাসন কায়েম করে হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরি করে এখানে শরিয়ত শাসন কায়েম করতে চেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ঘুমিয়ে থাকা হিন্দুরা জেগে উঠে সেই বাম-তৃণমূলি চক্রান্তকে ধরে ফেলে সকলে একজোট হয়ে এবারের নির্বাচনে বিজেপির ছত্রছায়ায় এসে এই দুই জেহাদি শক্তিকে শুধু পরাজিতই করেনি, একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

এবারের ভোটদান সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে ৯২ শতাংশের বেশি। ভোটে দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া হিংসা ভুলে শান্তির পথ খুঁজে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তাই

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ সেই ভয়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক হানাহানি, পাড়ায় পাড়ায় দাদাগিরি আর বোমা-বন্দুকের আওয়াজে ক্লান্ত মানুষ আজ শুধু শান্তি চান। তাই এবারের ভোটের লাইন শুধুই ভোট দেওয়ার লাইন ছিল না— ছিল এক নিঃশব্দ প্রত্যাখ্যানের উপাখ্যান। প্রত্যাখ্যান— হিংসা, রক্তপাতের বিরুদ্ধে। একজন সাধারণ নাগরিক তো এটুকুই আশা করেন, আশা করেন ভয়শূন্য সুস্থির জীবন। আর এই ভয়শূন্য, রক্তপাতশূন্য ভোটের জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রাপ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের।

এবারের ভোটে সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় যা ছিল তা হলো ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যবাসীকে, কতকগুলো ভয়ানক বার্তা দেওয়া যা অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে। যেমন--- 'এবার দুরন্ত খেলা হবে' (রাজনীতির উঠোনে 'খেলা হবে' শব্দটি কি একটি প্রচ্ছন্ন ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে না!) কিংবা 'ভোটের পর পিঠে পোস্টার বেঁধে বলতে হবে, আমি বিজেপি করি না' বা 'মা-বোনেরা রুখে দাঁড়াবেন বাড়িতে যা আছে, তাই নিয়ে, রান্না করেন তো, আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন তো?' অথবা অভিষেক ব্যানার্জির 'তিনি উদার, আমি নই, চার তারিখের পর সব হিসেব হবে। স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে'— এ ধরনের উক্তি কীসের ইঙ্গিত দেয়? শোভা পায় একজন রাজনৈতিক নেত্রী, যিনি রাজ্যের প্রধান নাগরিক তাঁর মুখ থেকে এরকম কথা বলা? মনে পড়ে, এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ, ১৯৭১-এর ভাষণ— 'প্রস্তুত থাকবেন, ঠাণ্ডা হলে চলবে না। হাতে যা আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।' প্রায় একই অর্থ কিন্তু ভাব কত পৃথক!

ভোট গ্রহণের দিনগুলিতে সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের চূড়ান্ত পেশাদারিত্বে পাড়ার মোড়ে মোড়ে জমায়েত, বাইক বাহিনীর দাপাদাপি বা রাজনৈতিক চোখ রাঙানির যে সংস্কৃতি দীর্ঘকাল রাজ্যকে গ্রাস করেছিল, তা সেদিন আক্ষরিক অর্থেই নিজেদের অন্দরমহলে গৃহবন্দি থাকতে বাধ্য হন। এই অভূতপূর্ব প্রশাসনিক সাফল্যের নেপথ্যে নির্বাচন কমিশন কঠোর এবং নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়ার জন্য জ্ঞানেশ কুমারকে ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভায় বিরোধী দলের ৭৩ জন সাংসদের দ্বারা ইমপিচমেন্ট বা পদচ্যুতির নোটিশেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা ছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা।

অনেকেই মনে করেন যখন ভোটারের মন থেকে রাজনৈতিক হিংসার ভয় সম্পূর্ণ দূরিভূত হয় তখন কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও উন্নয়নের মতো প্রকৃত আর্থসামাজিক প্রশ্নগুলি অনেক বেশি প্রাধান্য পায়। আর গণতন্ত্র তখনই সার্থক হয় যখন দেশের প্রান্তিক নাগরিকটিও কোনো রকম ভীতি ছাড়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারেন, তখন তাতে ভোটের ফলাফল যাই হোক না কেন, প্রকৃত জয় হয় সাধারণ মানুষের।

এবারের ভোটের লড়াই প্রমাণ করেছে দুর্নীতি বনাম স্বচ্ছ প্রশাসন। শোষণ বনাম উন্নয়ন। জেহাদি মোল্লাবাদী বনাম জাতীয়তাবোধ। দেশবিরোধী বনাম দেশপ্রেম। ভোটারদের এবারের সিদ্ধান্ত কয়েক প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে বলেই মনে করে অধিকাংশ মানুষ।

বিজেপির এই বিপুল জয়ের পর স্বাভাবিক ভাবেই বিশাল দায়িত্ব বিজেপির ঘাড়ে চাপালো। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা যেমন পুরণ করতে হবে তেমনি রাজ্যজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অশান্তির আগুনে যেন রাজ্যের কোনো মায়ের কোল খালি না হয়, কোনো স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে না যায় বা কোনো সন্তান পিতৃহারা না হয় এবং একজন নারীকেও যেন ধর্ষিতা হতে না হয়। এতো গেল এক দিক। এছাড়া ভোটের আগে বিজেপির সংকল্প পত্রে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবারে দেখে নেওয়া যাক সেই প্রতিশ্রুতিগুলো। যেমন— (১) প্রত্যেক মহিলাকে মাসে ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া। (২) পুলিশ বাহিনী-সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের অঙ্গীকার। (৩) বেকার যুবকদের জন্য মাসে ৩,০০০ টাকা ভাতা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ১৫,০০০ টাকা এককালীন সাহায্য। (৪) দুর্নীতির কারণে যাঁরা সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের জন্য বয়সসীমা ৫ বছর ছাড় দেওয়া। (৫) সরকার গঠনের মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা। (৬) কিষান সম্মাননিধি প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রের ৬,০০০-এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরও ৩,০০০ টাকা যোগ করে মোট ৯,০০০ টাকা কৃষকদের দেওয়া। এছাড়া অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ, সীমান্তের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা, সাংস্কৃতিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যে বন্দে মাতরম্ মিউজিয়াম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পিরিচুয়াল সার্কিট এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা, রাজ্যে চারটি নতুন উপনগরী বা স্যাটেলাইট টাউনশিপ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বিজেপি বঙ্গের ঋষি, মনীষী, মহাপুরুষদের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গকে বাস্তবায়ন করতে চায়। বিজেপির এই সংকল্পপত্রের কাজগুলোর কথা প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে ভোট প্রচারে এসে নিজেও জনসাধারণের সামনে পুনরায় তুলে ধরেছেন। কাজেই এই সমস্ত প্রতিশ্রুতির পূর্ণাঙ্গরূপে বিজেপি সরকারকে দিতেই হবে।

সবশেষে বলতে হয়, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই বিপুল জয়, যা বিজেপি নেতৃত্বও আশা করতে পারেননি। যাকে বলা হয় আশাতীত ফল। তবে যে যাই বলুন না কেন, এই জয় শুধু বিজেপির জয় নয়, এই জয় সনাতনী হিন্দুদের জয়। এই জয় পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারিত বাঙ্গালি হিন্দুদের জয়, এই জয় হিন্দুদের ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার জয়। এই জয় রাজ্যের হিন্দু বাঙ্গালিদের বেঁচে থাকার জয়, এই জয় ভারতের সুরক্ষার জয়। সর্বোপরি এই জয় সত্যের জয়। □

সঙ্গীতে ও নৃত্যে শিলিগুড়িতে বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

১৮১৩ সালে লালগোলার জমিদার রামশঙ্কর রায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কলকলির ঘাট থেকে ভেসে আসা কাঠামোয় মৃন্ময়ী শৃঙ্খলিত জগজ্জননী কালী মূর্তি তৈরি করান। পুরোহিত আসেন কাটোয়ার বিখ্যাত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য পরিবার থেকে। ডাকাতরা এদের পরিবারের আরাধ্য দেবী চুরি করে নিয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস দেবী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই জমিদার বাড়িতে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসে লালগোলায় দেবী দর্শনে যান। পুরোহিত মায়ের পায়ে জবা ফুলের অর্ঘ্য দেওয়ার সময় উচ্চারণ করেন— 'জয় মা দনুজ দলনী বন্দে বন্দিনী মাতরম্'। এই শ্লোকের দ্বিতীয় স্তবকে বন্দিনী শব্দ তুলে দিয়ে তিনি 'বন্দে মাতরম্' এই শব্দের পুনরায় সন্ধান পান। বাল্যকালে গৃহশিক্ষক পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণির কাছে পাঠ নিয়েছিলেন রামায়ণ-মহাভারতের। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের মুখে শুনেছেন—'জননী জন্মভূ মিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। হয়তো ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত বেদবাক্য 'অহং রাষ্ট্রী' শব্দে তিনি আলোড়িত ছিলেন। এই সব কিছু নিয়ে সৃষ্টি হলো 'বন্দে মাতরম্'।

এর পরের ইতিহাস তো সবারই জানা। অগ্রজ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় এই কাব্যের শব্দ চয়নে খুশি ছিলেন না। সর্বজনে এটি গ্রহণ করবে কিনা তাতে সন্দিহান ছিলেন। বঙ্কিম কিন্তু এই গানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই প্রত্যয়ী ছিলেন। তাই কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী পণ্ডিত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যকে অনুরোধ করেছিলেন এই কাব্যে সুরারোপ করতে। যদু ভট্ট জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। ফলে তাঁর কণ্ঠেই 'বন্দে মাতরম্' শুনেছিলেন যুবক রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৬ সালে উত্তর কলকাতার হেদুয়া পার্কে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের প্রথম দু'টি স্তবক গেয়ে শোনান। ইতিহাস তৈরি হয় সেই সময়েই। এরপর পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' কংগ্রেসের বিভিন্ন মঞ্চে গেয়ে শোনাতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবী। বঙ্কিমচন্দ্র তখন আর ইহজগতে নেই। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে 'বন্দে মাতরম্'। এটি আর কেবল সঙ্গীতে আবদ্ধ না থেকে বিপ্লবীদের কাছে হয়ে ওঠে মহামন্ত্র।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন 'বন্দে মাতরম্' নিছক একটি সঙ্গীত নয়, বরং এটি জাতীয়তার মূল মন্ত্র। তাই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষিপুরুষ বলে অভিহিত করেন। ধীরে ধীরে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দলের আড়ালে বিপ্লব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। হাজার হাজার যুবক দেশমাতৃকার মুক্তির শপথে বিপ্লবে অংশ নেয়। মন্ত্র একটাই 'বন্দে মাতরম্'। মহারাষ্ট্রের কিশোর কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বালক বয়সেই দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বিদ্যালয়ে ইংরেজ রাজপুরুষের সামনে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন। জাতীয়তার ধাত্রীভূমি বঙ্গপ্রদেশে যে তাঁকে আসতেই হবে। তাই ডাক্তারি পড়ার অছিলায় বালকৃষ্ণ মুঞ্জের সহায়তায় তিনি কলকাতায় আসেন। এর পরের ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গড়ে তোলার সমস্ত উপাদান তিনি সংগ্রহ করেন এখান থেকেই।

গত ২২ মার্চ, শিলিগুড়ি সংস্কার ভারতী কলেজপাড়া চর্চাকেন্দ্র এবং অন্য ধ্রুপদ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (শিলিগুড়ি)-র উদ্যোগে 'সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম্'-শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হল শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থ-র প্রেক্ষাগৃহে।

স্বাগত ভাষণ দান করেন 'সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ'-এর সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র জয়দেব চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা প্রবাহের অখিল ভারতীয় সংযোজক জে নন্দকুমার, শিলিগুড়ি সারদা শিশুতীর্থের প্রধান আচার্য্য অনিরুদ্ধ দাস, বিশিষ্ট নজরুল গবেষক সঙ্গীত শিল্পী ডঃ দীপা দাস, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুব্রত দত্ত, কবি দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর একাধিক শিল্পী গানে-কবিতায়-নৃত্যে- যন্ত্রসঙ্গীতে 'বন্দে মাতরম্'কে মঞ্চে উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে নাম করতেই হয় সঞ্চিতা ভট্টাচার্য্য, অংশুমান পালের। স্বাধীনতার পূর্বে 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে সমাজে যে আলোড়ন উঠেছিল তার এক অপূর্ব কথন তাঁদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে। সুমিত বণিকের বেহালা বাদ্যযন্ত্রে 'বন্দে মাতরম্' নিবেদন দর্শকদের মুগ্ধ করে। ডঃ শুভ্রা মিত্রের পরিচালনায় সৃজনশীল নৃত্য ভাবনায় বিভিন্ন সুরে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের একটি অসাধারণ উপস্থাপনা এই মহামন্ত্রের স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলে। শ্রীমতী সোমা সান্যাল চক্রবর্তীর পরিচালনায় শত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশন শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সঞ্চিতা ভট্টাচার্য্য। উদয় কুমার দাসের ব্যবস্থাপনায় ভারত সরকারের যুবক্রীড়া মন্ত্রকের 'মাই ভারত টিম' এর স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। □

এক ফোঁটা জল

রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু যে খেয়ালি লোক তা জানতাম। কিন্তু তার খেয়াল যে এতদূর খাপছাড়া হতে পারে তা ভাবিনি। সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠি পেয়ে আমার মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল, ভাবলাম— শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হলো অথচ আমি একটা খবর পেলান না! আমি হলাম এদিককার ডাক্তার।

যাই হোক, নিমন্ত্রণ যখন করেছেন তখন যেতেই হবে। গেলাম। গিয়ে দেখি শ্যামবাবু কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া। আমাকে দেখেই বললেন, ‘‘আসুন ডাক্তারবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক!’’ দু’চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম— ‘‘আপনার মায়ের হয়েছিল কী?’’

শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন— ‘‘ও, আপনি শোনেননি বুঝি! আমার মা তো আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন— তাঁকে আমার মনেও নেই— ইনি আমার আর এক মা, সত্যিকারের মা ছিলেন।’’

ভদ্রালোকের গলা কাঁপতে লাগল।

আমি বললাম— কী রকম? কে তিনি?

তিনি বললেন— ‘‘আমার মঙ্গল গাই— আমার মা কবে ছেলেবেলায় মারা গেছেন মনে নেই— সেই থেকে ওই গাইটিই তো দুধ খাইয়ে আমাকে এত বড়ো করেছে। ওরই দুধেই আমার দেহ মন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পর ছেড়ে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু!’’

এই বলে তিনি হু হু করে কেঁদে ফেললেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

(বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। একজন কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। তিনি বনফুল ছদ্মনামেই অধিক পরিচিত।)

জাতীয় উদ্যান

চান্দোলি

চান্দোলি জাতীয় উদ্যান মহারাষ্ট্রের সাংলি, সাতারা, কোলহাপুর, ও রত্নগিরি জেলার সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এটি ১৯৮৫ সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে এবং ২০০৪ সালে জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর আয়তন ৩১৭.৬৭ বর্গকিলোমিটার। এটি ওয়ার্না নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এবং এর ভেতরে প্রাচিতগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই উদ্যানে ২৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১১২ প্রজাতির পাখি, ২০ প্রজাতির উভচর ও সরীসৃপ রয়েছে। এখানে জঙ্গল সাফারি (জিপ), ট্রেকিং, নদী ভ্রমণ (ওয়ার্না ড্যাম), পাখি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের এই উদ্যান পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময় হলো অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১২

অপি (....ও)

গণেশ: পঠতি। দিনেশ: **অপি** পঠতি।
গণেশ পড়ে। দিনেশও পড়ে।
গণেশ: লিখতি। দিনেশ: **অপি** লিখতি।
গণেশ লেখে। দিনেশও লেখে।
শচিন: ক্রীডতি। সৌরভ: **অপি** ক্রীডতি।
অহং খাদামি। ভবান্ **অপি** খাদতি।
বালিকা হসতি। বালক: **অপি** হসতি।
সোনালী গায়তি। সুধীর: **অপি** গায়তি।
ভবান্ বদতু। ভবতী **অপি** বদতু।
পিতা চায়ং পিবতি। অহম্ **অপি** পিবামি।

ভালো কথা

মা

মা, তুমি শুধু আমার মা নও। তুমি আমার সবচাইতে বড়ো ভরসা, সাহস আর ভালোবাসার জায়গা। যখন আমি ভুল করি, তুমি রাগ করো ঠিকই, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাকেই আগলে রাখো। আমার ছোটো ছোটো সাফল্যে তোমার হাসি আর খুশি দেখে মনে হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান ছেলে আমি।

তুমি না থাকলে আমি হয়তো এতটা শক্ত হতে পারতাম না। সত্যি বলতে, তোমাকে ছাড়া পড়াশোনাই করতে পারি না। তুমিই আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি, আমার পড়াশোনার মেরুদণ্ড। আমার প্রতিটা স্বপ্নের পেছনে তোমার ত্যাগ, আশীর্বাদ আর নির্ঘুম রাত লুকিয়ে আছে। মা, তোমাকে হয়তো প্রতিদিন বলা হয় না, আমি কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসি। তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদ।

মাতৃদিবসে পৃথিবীর সকল মাকে শতকোটি প্রণাম জানাই।

ত্রিশান মজুমদার, নবমশ্রেণী, ভাটনগর আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়, নতুন দিল্লি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

গরমকাল !

সনৎ কুমার দাস, ষষ্ঠশ্রেণী, মানিকচক, মালদা

এবারের গরম কালের
কী যে হলো হাল,
প্রতিদিনই বৃষ্টি বাদল
মনে হচ্ছে না গরম কাল।
এমনই যদি হতেই থাকে
খুবই ভালো তবে,
আমবাগানে ঘুরতে ফিরতে
খুবই মজা হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ধর্মযুদ্ধে একনায়কতন্ত্র ও তোষণনীতির পতন

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২৬ সালের নির্বাচন এক যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দীর্ঘদিনের ক্ষমতাসীন শাসনের পর মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ, হতাশা এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, তার বিস্ফোরণ ঘটেছিল এই নির্বাচনে। বহু মানুষের কাছে এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, বরং এক আদর্শগত সংগ্রাম— এক ধরনের 'ধর্মযুদ্ধ'— যেখানে তারা মনে করেছে পশ্চিমবঙ্গের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মতে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক কাঠামো থেকে স্বৈরাচারী শাসনের রূপ নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত সবকিছু একদলীয় প্রভাবের অধীনে চলে গিয়েছিল। 'দিদি বলেছে'— এই বাক্যটি যেন প্রশাসনিক নির্দেশের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমর্থকদের কাছে এটি ছিল শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতীক, কিন্তু বিরোধীদের মতে এটি ছিল স্বৈরতন্ত্রের লক্ষণ।

রাজনীতিতে ব্যক্তিপূজার প্রবণতা নতুন নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বহু মানুষ অনুভব করতে শুরু করেন যে দল এবং সরকার ধীরে ধীরে এক পরিবারের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত উত্থান ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিয়ে বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ যে, দলের মধ্যে প্রবীণ নেতাদের মতামত ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে চলে আসছে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী।

এই সময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে ধর্মীয় রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের বহু হিন্দু নাগরিকের একাংশের মধ্যে ধারণা জন্মায় যে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হচ্ছে। দুর্গাপূজা, রামনবমী বা হনুমান জয়ন্তীর মতো উৎসবকে ঘিরে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়।

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় 'অনুপ্রবেশ' ইস্যু বহু বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির কেন্দ্রে রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে এসেছে যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রাজ্যের জনসংখ্যাগত ভারসাম্য, নিরাপত্তা ও অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলছে। সীমান্ত রাজনীতির এই প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মধ্যে প্রবল আবেগ সৃষ্টি করেছিল।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপি এই আবেগকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে। তারা 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর ধারণা সামনে আনে— অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকলে উন্নয়ন দ্রুত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শা পশ্চিমবঙ্গের একের পর এক সভা করে উন্নয়ন, জাতীয়তাবোধ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নকে সামনে আনেন।

শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি, সনাতনী সভ্যতার প্রতীক। প্রায় ৮০০ বছর পর এই রাজ্যে ফিরে এলো হিন্দু ঐক্য ও হিন্দু সমাজের স্বাধীনতা। পশ্চিমবঙ্গ ভারতকে ফিরিয়ে দিল পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি, সেভেন সিস্টার-এর নবনির্মাণের সূচনা।

বিজেপির প্রচারে 'সোনার বাঙ্গলা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান হয়ে ওঠে। তাদের বক্তব্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন শিল্পহীনতা, বেকারত্ব ও রাজনৈতিক হিংসার মধ্যে আটকে রয়েছে। কেন্দ্রের প্রকল্পগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি কমলে বঙ্গের অর্থনীতি নতুন গতি পেতে পারে। এই বার্তা শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত অনেক মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল।

তবে এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার পেছনে শুধুমাত্র ধর্মীয়

ফঃ ৬

বা জাতীয়তাবোধের আবেগ কাজ করেনি। অর্থনৈতিক অসন্তোষও ছিল একটি বড়ো কারণ। চাকরির অভাব, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লা ও গোরুপাচার কাণ্ড, বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ— এসব ইস্যু সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। বিরোধীরা বারবার দাবি করেছিল যে, দুর্নীতি তৃণমূল সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর গভীরে প্রবেশ করেছে।

বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে। বহু চাকরিপ্রার্থী বছরের পর বছর আন্দোলন করেন। তাদের চোখে এই আন্দোলন শুধু চাকরির জন্য নয়, ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায়। বিরোধীরা এই ঘটনাকে 'যোগ্যতার ওপর রাজনৈতিক প্রভাবের জয়' বলে তুলে ধরে।

রাজনৈতিক ভাষণে মহাভারতের উপমা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। অনেক সমর্থক এই নির্বাচনকে 'ধর্মযুদ্ধ' হিসেবে বর্ণনা করলেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক লড়াইয়ের সমাধান ভোট ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই হয়। মহাভারতের যুদ্ধ ছিল ন্যায় ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রতীক; আধুনিক গণতন্ত্রে সেই দ্বন্দ্বের রূপ হলো নির্বাচন, মতপ্রকাশ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দীর্ঘদিন ধরেই আদর্শগত সংঘাত রয়েছে। একসময় বামপন্থী আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। পরে তৃণমূল কংগ্রেস 'মা-মাটি-মানুষ'-এর স্লোগান নিয়ে উঠে আসে। আবার বিজেপি 'জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ'-এর কথা বলে মানুষের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করে। এই ধারাবাহিকতা দেখায় যে রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চায়, কিন্তু সেই পরিবর্তনের রূপ সময়ের সঙ্গে বদলে যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগগুলির মধ্যে একটি ছিল রাজনৈতিক সহিংসতা। বিরোধী কর্মীদের ওপর হামলা, পঞ্চায়েত ভোটে সংঘর্ষ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ— এসব বিষয় জাতীয় রাজনীতিতেও আলোচিত হয়েছিল।

তবে, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ধর্মীয় সহাবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কাজী নজরুল ইসলামের ভাবনা বারবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্বের কথা বলেছে। তাই রাজনৈতিক সংঘাত যতই তীব্র হোক, বঙ্গের বহু মানুষ এখনো বিশ্বাস করেন যে রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত ঐক্য, বিভাজন নয়।

তবুও ২০২৬ সালের রাজনৈতিক আবহে আবেগ ছিল প্রবল। বিজেপির বহু সমর্থক মনে করেছিলেন যে তারা কেবল একটি দলকে হারাচ্ছেন না, বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবসান ঘটাচ্ছেন। তাদের কাছে এটি ছিল প্রশাসনিক পরিবর্তনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পুনর্দখলের প্রশ্ন।

এখানে নির্বাচন শুধুমাত্র রাস্তা, বিদ্যুৎ বা কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি পরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহাসিক স্মৃতির সঙ্গেও জড়িয়ে যায়। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ক্লান্তি। যে দল একসময় পরিবর্তনের প্রতীক ছিল, সময়ের সঙ্গে সেই দলই 'প্রতিষ্ঠান'-এ পরিণত হয়। আর গণতন্ত্রে দীর্ঘ শাসনের পর মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।

বিজেপি সেই আকাঙ্ক্ষাকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠন গড়ে তোলে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগ্রাসী প্রচার চালায় এবং জাতীয় নেতৃত্বকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে সরাসরি যুক্ত করে। এই কৌশল তাদের দ্রুত শক্তিশালী বিরোধী শক্তিতে পরিণত করে।

তবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরও আসল পরীক্ষা শুরু হয় শাসনের ক্ষেত্রে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা হয়, তা বাস্তবায়ন করাই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ প্রত্যাশা করে।

'ধর্মযুদ্ধ' শব্দটি আবেগ তৈরি করতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রে শেষ পর্যন্ত জনগণের কল্যাণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি নতুন সরকারও দুর্নীতি, স্বজনপোষণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একই পথে হাঁটে, তাহলে মানুষের হতাশা আবারও ফিরে আসবে।

মহাভারতের শেষে যেমন যুদ্ধের মূল্য ছিল বিপুল ধ্বংস, তেমনি বাস্তব রাজনীতিতেও অতিরিক্ত বিদ্বেষ সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সহনশীলতা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং আইনের শাসন বজায় রাখাও সমান জরুরি।

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই প্রশ্নের ওপর— রাজনীতি কি কেবল ক্ষমতা দখলের লড়াই হয়ে থাকবে, নাকি সত্যিই মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যম হবে? শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতি— এই ক্ষেত্রগুলিতে বাস্তব অগ্রগতি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক জয়ই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ২০২৬ সালের নির্বাচন তাই শুধুমাত্র একটি দলের উত্থান বা পতনের গল্প নয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশা, ক্ষোভ, পরিচয়বোধ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। কেউ এটিকে ধর্মযুদ্ধ বলবেন, কেউ রাজনৈতিক বিপ্লব, আবার কেউ গণতান্ত্রিক রদবদল। কিন্তু ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ঘটনাকে বিচার করে ফলাফলের ভিত্তিতে— মানুষের জীবন কতটা বদলালো, সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।

তবে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের এই নতুন অধ্যায় এক নবজাগরণ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি, সনাতনী সভ্যতার প্রতীক। প্রায় ৮০০ বছর পর এই রাজ্যে ফিরে এলো হিন্দু ঐক্য ও হিন্দু সমাজের স্বাধীনতা। পশ্চিমবঙ্গ ভারতকে ফিরিয়ে দিল পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি, সেভেন সিস্টার-এর নবনির্মাণের সূচনা।

নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারের কী কী করণীয়

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল জনসমর্থন পেয়েছে এবং দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। সংকল্পপত্র অনুযায়ী রাজ্য সরকার তার কর্মসূচি নির্ধারণ করবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি আশু কর্তব্যের কথা নতুন সরকারকে স্মরণ করাতে চাই।

সবার আগে প্রধান কর্তব্য হলো রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার যে শোচনীয় অবনতি ঘটেছে গত প্রায় ছয় দশক ধরে, তার উন্নতি, নাহলে কোনো উন্নয়নই জনগণকে স্পর্শ করবে না। সেই ছয়ের দশক থেকে মাওবাদী আন্দোলনের নামে শুরু হয়েছে নির্বিচার গণহত্যা যা সিপিএম

আমলে ব্যাপকতা লাভ করে এবং দৈনন্দিন খবরে রূপান্তরিত হয় যার সঙ্গে যোগ হয় গ্রামবাঙ্গলা জুড়ে নারীধর্ষণ যা তৃণমূলের আমলে শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মিত নিরীহ মানুষ হত্যার খবর সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে যা দেখে বাঙ্গালি আতঙ্কিত হয়েছে, শঙ্কিত হয়েছে নিজের বাড়ির নারী-পুরুষ স্কুল কলেজ থেকে, কাজের জায়গা থেকে ঠিকমত ফিরতে পারবে কিনা ভেবে। এই আতঙ্ক ও সন্ত্রাস থেকে আগে বাঙ্গালিকে মুক্তি দিতে হবে। তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে। তারজন্য সর্বপ্রথম পুলিশের দলদাস তকমা ঘোচাতে হবে। পুলিশকে নিরপেক্ষ করে তুলতে হবে। তবেই রাজ্যে কাজের পরিবেশ ফিরবে। সরকার কাজে মন দিতে পারবে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সব ক'টি প্রকল্পকে রাজ্যে শুরু করতে হবে যা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনের মান উন্নত করবে। এরপর একে একে দরকার এই বিষয়গুলি—

(১) কাজের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে সবার আগে প্রয়োজন শিল্পের উন্নতি বা শিল্পে রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই রাজ্যে একটার পর একটা শিল্প, কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমশ শিল্প বিকাশের জোয়ার আসে। প্রথমে দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ভারী শিল্পের উত্থান শুরু হলেও ক্রমশ তা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা সময়কালে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি ছিল সূতি ও হস্তচালিত তাঁত, পাট, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, লৌহ ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কাগজ, কাচ, রাবার এবং ছাপাখানা ও বই বাঁধাই প্রভৃতি। এগুলি ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্যের নিট উৎপাদনের ২১ শতাংশ জোগান দিত। এছাড়া এই রাজ্যে ছিল কয়লার প্রভূত মজুত ভাণ্ডার যা ছিল সমগ্র দেশের মোট মজুতের এক-তৃতীয়াংশ। এছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থের মধ্যে ছিল ডলোমাইট, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, কপার প্রভৃতি। এই সবের উপর ভিত্তি করে ডাঃ রায় রাজ্যে একের পর এক শিল্প কারখানা গড়ে তোলেন যদিও কেন্দ্রের কয়লা ও লৌহ ইস্পাতের উপর মাশুল সমীকরণ নীতি, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প উপাদানের উপর কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৬ ও অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক আইন, ১৯৫৭, যেগুলি সমগ্র দেশে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প উপাদান ও কাঁচামালের একই দাম বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জারি হয়েছিল, রাজ্যে শিল্প বিস্তারে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছিল, তবে এই কিছুই ডাঃ রায়ের শিল্পোদ্যমে বাধা দিতে পারেনি। প্রায় সমগ্র '৫০-এর দশক ও '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজ্য শিল্প বিস্তারে সমগ্র দেশের মধ্যে প্রথম ছিল যার দরুন ১৯৬৫ সাল নাগাদ রাজ্যের আয়ে শিল্পের অবদান ছিল ৩৬ শতাংশ যা ছিল সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

এর পরই রাজ্যের আয়ে শিল্পের অবদান কমতে থাকে। বর্তমানে রাজ্যের আয়ে শিল্পের অবদান গুজরাটে সর্বাধিক ৪৫ শতাংশ আর এমনকি ওড়িশায় তা ৪০ শতাংশ। বর্তমানে মূলত নির্মাণ ও আইটির মতো সেবাক্ষেত্রের অবদানের কারণে পশ্চিমবঙ্গের আয়ে শিল্পক্ষেত্রের

অবদান ২৪ শতাংশ। নানা কারণে গত ছয় দশক ধরে বিভিন্ন শিল্প একের পর এক রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। এর মধ্যে ছিল ১৯৬৭ পরবর্তী ঘন ঘন রাজনৈতিক পালাবদল ও অস্থিরতা, মাওবাদী আন্দোলন, সিপিএমের জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি যার দরুন একের পর এক শিল্প রাজ্য ছেড়ে চলে যায় ও বন্ধ হতে থাকে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গুরে টাটাদের ন্যানো মোটরগাড়ি কারখানার জঙ্গি বিরোধিতা ও পরিণামে তাদের রাজ্য ছেড়ে গুজরাটে চলে যাওয়া এক্ষেত্রে কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়, যার দরুন রাজ্যে নতুন শিল্প আসা একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। আজ রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে নির্মাণ ও সেবাক্ষেত্রের অবদানই সর্বাধিক। আজ যেমন করে হোক বিজেপিকে রাজ্যের উৎপাদন ভিত্তিক আগের শিল্পগৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। এটাই হবে সরকারে এসে বিজেপি দলের প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে, রাজ্যে বেকারত্বের হার ২.২ শতাংশ যা জাতীয় হারের, ৩.২ শতাংশ থেকে কম, কিন্তু রাজ্যে শ্রমজীবীর বেশিরভাগ অংশই, প্রায় ৬৯ শতাংশ; আছে কৃষি ও সেবাক্ষেত্র যেখানে উৎপাদনমুখী শিল্পে কাজ করে মাত্র ১৮.৮ শতাংশ। ক্রমশ কৃষি থেকে লোক কমিয়ে শিল্প উৎপাদনে নিয়ে আসতে হবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। ডাঃ রায় কৃত রাজ্যের শিল্পবিকাশে প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন হয়েছিল যার একটি বড়ো অংশ বাইরের রাজ্যগুলি থেকেও আসতো। আর আজ এই রাজ্য থেকে কর্মীরা বাইরের রাজ্যে যাচ্ছে কাজের সন্ধানে। বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বিভিন্ন হিসাবে ২৩ লক্ষ থেকে ৩৩ লক্ষ। কর্মীদের এই বহির্মুখিনতা কমিয়ে তাদের রাজ্যেই কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। এরজন্য ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত রাজ্যে থাকা সমস্ত ধরনের শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন প্রয়োজন এবং প্রয়োজনে রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া শিল্পগুলির সঙ্গে পুনরায় ফিরে আসার ব্যাপারে কথাবার্তাও বলতে হবে।

(২) শিল্প বিকাশের সঙ্গে রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। কলকারখানা হলে প্রচুর মানুষের যেমন কাজ হবে, তেমনই সময় মেনে শ্রমিক, কর্মচারীরা যেন কাজ করেন তাও দেখতে হবে। কাজের সময় ফাঁকি দেওয়া চলবে না এটি স্পষ্টভাবে সরকারকে জানাতে হবে। অফিস কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম জারি থাকবে। মনে রাখতে হবে, সিপিএম তথা বামফ্রন্ট শাসনে শুরু হওয়া এবং আজও চলতে থাকা জঙ্গি শ্রমিক, কর্মচারী আন্দোলন দেখতে দেখতে রাজ্যবাসী ক্লান্ত। এখন রাজ্যে শিল্প তথা সার্বিক উন্নয়নে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

(৩) রাজ্যের কৃষি উন্নয়নে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমাতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে নদীগুলির গভীরতা বাড়াতে হবে। এই রাজ্যে প্রচুর নদী আছে যেগুলি সংস্কারের অভাবে মৃতপ্রায়। নিয়মিত সংস্কার করে সেগুলির নাব্যতা বাড়াতে হবে। এরজন্য নদীর বুকের উপর দিয়ে রাস্তা বানিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে হবে। নদীভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের সার্বিক বিকাশ ঘটাবে। পাশাপাশি ২০১৫ সালে চালু হওয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা'র অধীনে চাষিদের নিয়ে আসতে হবে, যার দরুন ৫০ শতাংশ কম খরচে তারা ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সুবিধা পেতে পারে। সমগ্র ভারতে প্রায় ৮.৯৭ মিলিয়ন হেক্টর জমি এর অধীনে আনা হয়েছে যার জন্য জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও চাষিদের লাভ উভয়ই বেড়েছে। এরসঙ্গে চাষিরা e-NAM (National Agricultural Market) ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামে বসে ফসল বিক্রয় করতে পারবে। ২০১৬ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্প দেশের ১,৩৮৯টি মন্ডিকে সংযুক্ত করেছে এবং যার মাধ্যমে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৭৮,৪২৪ কোটি টাকার শস্য বিক্রয় হয়েছে এবং চাষিরা বর্ধিত লাভ পেয়েছে। এরসঙ্গে বয়স্ক চাষিদের পিএম কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে আনতে হবে যার সাহায্যে তারা বছরে তিনটি কিস্তিতে ২,০০০ টাকা করে মোট ৬,০০০ টাকা পেতে পারে যা তাদের ফসল উৎপাদনে বিনিয়োগের কাজ করবে। মৎস্যচাষিদের বিশেষত সমুদ্রে নিয়মিত মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে এনে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

(৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নেও জোর দিতে হবে এবং এরজন্য স্কুল শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে এবং ঢেলে সাজাতে হবে। সর্বপ্রথম বছরে দু'টি করে এসএসসি-র শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিতে হবে। রাজ্যে গত পনেরো বছরে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনকারীর সাম্প্রতিক সংখ্যা অনুযায়ী এই রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৮৪ লক্ষ থেকে ১ কোটি যা মোট বেকারের প্রায় ১৩ শতাংশ। সবার প্রথমে তাদের স্কুল, কলেজে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা ও নিয়োগ এই রাজ্য ভুলতে বসেছে। তা ফিরিয়ে আনতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। এর জন্য একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি ও রাজনীতীকরণ দূর করতে হবে। প্রত্যেক স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, সঙ্গে নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী নতুন নতুন বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ছাত্রদের কোনো মতেই রাজনীতির মিটিং, মিছিলে নেওয়া চলবে না, আর শিক্ষকরা রাজনীতির কাজ করতে পারেন শুধুমাত্র স্কুল ছুটির পর বা ছুটির দিনে। সিপিএমের সময় থেকে শিক্ষকদের রাজনীতিতে এনে আর ছাত্রদের দিয়ে মিছিল মিটিং করিয়ে শিক্ষার সার্বিক অধঃপতন ঘটানো হয়েছে। যার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। স্কুলে পঠনপাঠন বাদ দিয়ে মিড ডে মিলের আয়োজন চলবে না। ভেবেচিন্তে এর জন্য আলাদা সময় ও কর্মী মণ্ডলীর ব্যবস্থা করতে হবে। জনসংখ্যা অনুযায়ী কোনো স্থানে প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করতে হবে এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী হবে। স্কুলে স্কুলে আদর্শ লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি। লাইব্রেরিতে আজেবাজে (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর) বই রাখা যাবে না। প্রত্যেক স্কুলে, যে স্তরেরই হোক না কেন, খেলার মাঠ ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজি শিক্ষা শুরু করতে হবে যাতে গরিব বাবা-মায়েদের প্রভূত খরচ সাপেক্ষ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পিছনে ছুটতে না হয়।

(৫) রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার পর্যাপ্ত উন্নতি করতে হবে। পুলিশ ও থানা আধিকারিকদের দলীয় রাজনীতির বাইরে এসে নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকটি অপরাধজনিত ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। পুলিশের প্রতি আজ মানুষের কোনো আস্থা নেই। এরজন্য পুলিশ নিজে দায়ী, বস্তুত পুলিশ আজ নেতাদের পা চেটে চেটে নিজেকে হাস্যকর জায়গায় নিয়ে এসেছে। এই অবস্থা দূর করতে হবে। শাসক

দলের নেতা-মন্ত্রীদের কোনো ভাবেই পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। জ্যোতি বসু সবসময় স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজের হাতে রাখতেন। যুক্তফ্রন্ট আমলে এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। সরকার ভেঙে যায় এমন অবস্থা। শেষপর্যন্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন— এই দু'ভাবে ভাগ করে মতবিরোধ সাময়িকভাবে মেটানো হয়। কিন্তু গাজোলের ওসি-র বদলি অর্ডারে অজয়বাবু সই করলেও জ্যোতি বসু তা নাকচ করে দেন এবং এই সংঘাতে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। গান্ধীবাদী অজয়বাবু নিজের সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলে কলকাতার কার্জন পার্কে অনশনে বসেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এটি করেননি। কিন্তু ১৯৭৮ সালে সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে দীর্ঘদিন এই ট্র্যাডিশন বজায় ছিল। জ্যোতি বসুর উদ্দেশ্য ছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে দলীয় প্রভাব গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া এবং নির্বিচার হত্যা, ধান লুঠ, অপারেশন বর্গার নামে জমি দখল ইত্যাদি কাজে পুলিশ যেন হস্তক্ষেপ না করে তা দেখা। বুদ্ধবাবু ও তারপর মমতা ব্যানার্জিও এই ধারা বজায় রাখেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পরও কীভাবে পুলিশের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেখাশোনা করা কী করে সম্ভব হয় সেটা যদিও কেউ জানে না। অন্য অনেক রাজ্যে এই জিনিস দেখা যায় না। কাজেই রাজ্যের জনসাধারণ চায় যে, বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার এই ধারার বদল ঘটাবে। পুলিশকে, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। একটি সভ্য সরকারের অধীনে পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল পুলিশ বাহিনী অবশ্যই কাম্য।

(৬) নারীদের জীবনযাত্রায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে হবে। মেয়েরা যেন রাতবিরেতেও রাস্তায় বেরোতে ভয় না পায়। মেয়েদের রাতে কাজে যাওয়া ও কাজ থেকে ফেরা যেন অবাধ হয়। স্কুল-কলেজের চারপাশে দুর্বৃত্ত বাহিনীর ঘোরাফেরা বন্ধ করতে হবে এবং দাগি আসামিরা যেন কোনোভাবেই জেলের বাইরে না থাকে নিশ্চিত করতে হবে। যৌন নির্যাতনমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আলাদা পুলিশ বাহিনী রাখতে হবে। মেয়েদের প্রতি আচার-আচরণেই যেন সরকার তথা পুলিশের প্রতি নির্ভরতা বোঝা যায়।

(৭) সাধারণ রাস্তাঘাট ও সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, রাস্তাঘাট হলো শিল্পোন্নতি ও সেচ ব্যবস্থা কৃষি উন্নতির ভিত্তি। এখন গ্রাম ও শহরের সড়ক জেলা সড়ক ও রাজ্য সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে যা 'ভারত মালা' প্রকল্পের অধীন। রাস্তা উন্নয়নের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ওই প্রকল্পের মাধ্যমে দেয় যা অর্থ কমিশনের অনুমোদন প্রাপ্ত। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার রাস্তা উন্নয়ন তথা যোগাযোগ পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রভূত জোর দিয়েছে, সুতরাং সঠিকভাবে প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে এই অর্থের সদ্ব্যবহার করতে হবে। নদীভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যে কাজে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া সম্ভব অর্থ কমিশনের মাধ্যমে। নীতি আয়োগও রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ সাহায্য করে যা উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে আদায় করতে হবে। সড়ক বিস্তারে রাজ্য সরকারকে বিলম্ব ছাড়াই প্রয়োজন মতো জমি বরাদ্দ করতে হবে।

(৮) চতুর্দশ অর্থ কমিশন পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নেও অর্থ সাহায্য শুরু করেছে। দরকার স্থানীয় সম্পদ ও উপাদানভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা। 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'র মাধ্যমে আজ বিভিন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে রাজ্য ও জাতীয় সড়ক বিস্তৃত হচ্ছে যার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় স্তরের উন্নয়নও কাম্য যার মধ্যে রয়েছে— আধুনিক সুবিধাযুক্ত রিসর্ট, হোটেল ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা। এই সবই পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির সার্বিক উন্নয়ন কর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে। 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'র অধীনে ৭.৭১ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৪ শতাংশ। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র সুবিধা পুরোপুরি নিতে হবে যা ২০১৬ সালে শুরু হয়ে সমগ্র দেশে জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে স্থিরীকৃত ৩৩.২ মিলিয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২৬.৮ মিলিয়ন স্থায়ী আবাস তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি বাড়িতে জল ও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। এই সব সুবিধা এই রাজ্যের গরিব মানুষদের কাছেও পৌঁছে দিতে হবে। রাজ্য সরকারের খামখেয়ালিপনায় যা বন্ধ রয়েছে। আজ সমগ্র দেশের প্রতিটি পুরসভা ও পঞ্চায়েত ডিজিটাল ইন্ডিয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছে যার মধ্যে আছে ওয়াইফাই ও ব্রডব্যান্ড ব্যবস্থার প্রসার। সমগ্র দেশের ৮০ শতাংশ গ্রামের আওতায় এসেছে। সুতরাং সমগ্র দেশের সঙ্গে এই সামগ্রিক অঙ্গীভূত হওয়ার সুবিধা রাজ্যের প্রত্যেক পৌরসভা ও পঞ্চায়েতকে নিতে হবে। এরজন্য প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় সম্মেলনে, নীতি আয়োগের বৈঠকে, রাজ্যের পক্ষ থেকে উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। আর পৌরসভার মধ্যে বহুতল ফ্ল্যাট বানানোয় নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটবাড়ি হবে সমান উচ্চতার এবং ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারে আনতে হবে নিয়ন্ত্রণ। সঙ্গে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (rain water harvesting)-এ জোর দিতে হবে এবং এই ব্যবস্থা ছাড়া বহুতলের প্ল্যান পাস বা ছাড়পত্র পৌরসভা দেবে না। সঙ্গে বাড়িঘর নির্মাণে সিন্ডিকেটরাজ খতম করতে হবে যা সিপিএম আমল থেকে চলে আসছে এবং রাজ্য জুড়ে ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

(৯) রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের হাসপাতালগুলিতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে খুব বেশি রেফারেল না হয়। প্রত্যেক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন ধরনের কর্মী থাকা বাধ্যতামূলক। মহিলা ডাক্তার ও নার্সদের রাত্রিকালীন কাজের সময় উপযুক্ত নিরাপত্তা থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয় যার জন্য উপযুক্ত পুলিশ চৌকি থাকা বাধ্যতামূলক। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত, পিএম জন আরোগ্য যোজনা চালু করতে হবে যা গরিব মানুষকে বিনা খরচে (৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) আধুনিক চিকিৎসা পাওয়ার সুবিধা করে দেবে এবং যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। এটা ভুললে চলবে না যে, আরজি কর-এর ডাঃ অভয়ার বাবা-মা যাতে ন্যায় বিচার পান তাও সুনিশ্চিত করতে হবে।

(১০) বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্পী ও কলাকুশলীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। রাজ্যের শিল্পীরা এই সাহায্যের মাধ্যমে যাতে ক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নবনির্বাচিত সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে পারলে মানুষের হৃদয়স্পর্শ করতে পারবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। □

নির্বাচনে জয়ের নায়ক বিজেপির টিমওয়ার্ক

প্রদীপ মারিক

পশ্চিমবঙ্গে জয়ের ঝড় আছড়ে পড়ল। এই জয় এসেছে বিজেপির দুর্দান্ত টিমওয়ার্কে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলো। তৃণমূলের তাবড় তাবড় নেতারা কুপোকাত। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হবেন একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। কিন্তু বিরোধী দলনেতা কে হবেন। মমতা ব্যানার্জি হেরেছেন তবু পদ ছাড়তে চাইছেন না।

পশ্চিমবঙ্গের আকাশে উড়ছে গেরুয়া আবির। এই পরিবর্তনের ঢেউ পৌঁছে গিয়েছে সুদূর কালীঘাটে। আঞ্চলিক দলের অস্থির নেত্রী আর ঘরে থাকতে পারছিলেন না। তিনি কাকে বাঁচাবেন, প্রকাশ্যে ফাইল চুরি করে নিজেকে নাকি তার চোর-চোট্টা চার ফুটের চ্যালা চামুণ্ডাদের। তিনি নিশ্চিত ভবানীপুরের হার জেনে মেনে নিয়েই নিজের ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে ধরনায় বসেছিলেন নির্লজ্জের মতো। ভোটে মানে গণতন্ত্রের লড়াই এখানে হার-জিৎ হবেই, এখানে জিৎ যেমন মেনে নিতে হবে, হারকেও মেনে নিতে হবে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রীর এমন ব্যবহার কি শোভা পায়!

তৃণমূলের চার ফুটের নেতারা এখন কী করবে ভেবে উঠতে পারছেন না। আর হবেই না কেন! পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক দলের নেত্রী যে এখন নিজেই দিশেহারা। না হলে নিজের নির্বাচনী এলাকা ভবানীপুরের মঞ্চে উঠেও আবার নেমে পড়েছিলেন। আসলে তৃণমূলের অবস্থা টুকলি করে পাশ করা ছাত্রের মতো। প্রত্যেক নির্বাচনে পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ধমকে চমকে জোর করে মানুষের রায়কে বদলে নিজেরা জিতে যেত। কিন্তু এইবার তো আর হচ্ছে না। তৃণমূলের টুকলি যে ধরা পড়ে গিয়েছে। এবার তাই তাদের গায়ে জ্বালা ধরেছে। দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে তৃণমূলের চার ফুটের নেতাদের মতো হাতে তাবিজ কবজ ঝোলানোর মতো তারাও বিভিন্ন দরগায় গিয়ে হাতে দাগা বেঁধেছিলেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই যে তৃণমূলের রক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ পাননি। কারণ তোলামূল চুরি, জোচ্চুরি, রাহাজানিতে একবারে বিশ্বের নাম্বার ওয়ানের তকমা লাগিয়ে দিয়েছে।

একদিকে মোদী, অমিত শা, নিতীন নবীন, অন্যদিকে যোগী, রাজনাথ সিংহ, রেখা গুপ্ত-সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্বশীল প্রচার যেন মমতাকে দিশেহারা করে দিয়েছিলেন। এর সঙ্গে রয়েছে শুভেন্দুবাবু, সুকান্তবাবু, শমীকবাবুদের মতো ত্রিফলা আক্রমণ। কী করবে ভেবে উঠতে পারছিলেন না তৃণমূলের কাগুজে বাঘ তালপাতার সেপাই ভাইপো। ভাইপোর পা চাটা চামচে ফলতার চার ফুটের নেতার সব কারিকুরি শেষ। ভেবেছিল ধমকে চমকে আর অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে ভোট জিতে যাবে সেটা আর এই বারে হলো না।

নির্বাচন কমিশন কড়া নজরে রেখেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে। প্রথম দফায় বঙ্গবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করছে এবারের নির্বাচনে সেমিফাইনালে তারা স্বৈরতন্ত্রকে বিদায় জানাতে পেরেছে। দ্বিতীয় দফায় ৯৪ শতাংশ ভোটার দেখিয়ে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির বিদায় সময়ের অপেক্ষা।

অমিত শা বলেছিলেন, 'মোদীজী অযোধ্যায় রামমন্দির বানিয়েছেন। আর অন্য দিকে, হুমায়ুন কবীরকে দিয়ে এখানে মমতাদিদি বাবরি মসজিদ বানাতে চাইছেন। কান খুলে শুনে রাখুন, এক জনও বিজেপি কর্মী বেঁচে থাকলে পশ্চিমবঙ্গে বাবরি মসজিদ বানাতে দেবে না। এটা ভারতের ভূমি, এখানে কোনো বাবরি মসজিদের জায়গা নেই। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তৈরি হবে তো সেটা দুর্গামন্দির।' তিনি আরও বলেন, 'কৃষকেরা চিন্তা করবেন না। ১ মে-র পর তাঁদের থেকে ৩,১০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দামে সব ধান কিনে নেওয়া হবে। প্রতি বছর কৃষকদের ৯ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া কাটমানি বন্ধ করে সেই টাকাও কৃষকদের খাতে দেওয়া হবে। কিছু করতে গেলেই ভাইপো-ট্যাক্স দিতে হয়। সব জায়গায় সিন্ডিকেটরাজ চলছে। ৪ তারিখ আপনারা বিজেপির সরকার বানিয়ে দিন, সব সিন্ডিকেট পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' শ্যামপুরের সভায় অমিত শাহ বলেছিলেন, 'আমি গুন্ডাদের ভয় দেখাই তো দিদি আমার উপর রেগে যান। দিদি বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে আমি গুন্ডাদের ভয় দেখাচ্ছি।' তার পরেই শাহের প্রশ্ন, 'তো বলুন কী করব? কোলাকুলি করব? দিদি, আপনার গুন্ডাদের গ্যারাজে ঢুকিয়ে দিন। মা-বোনদের গায়ে হাত লাগলে কাউকে ছাড়া হবে না।'

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই ঐতিহাসিক জয়ের কারণ মোদীর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল টিম ওয়ার্ক এবং অবশ্যই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং রাজ্য থেকে মণ্ডল বুথ পর্যন্ত সুশৃঙ্খল দল পরিচালনা। বিজেপির বঙ্গজয়ে শমীক-শুভেন্দু-অর্জুনবাবুদের মতোই মহিলা মোর্চার একটা বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করছে। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বঙ্গবিজেপির জয় এক যুগান্তকারী ইতিহাস হয়ে রইল। □

মুসলমান ভোটে প্রাণস্পন্দন শুরু হয়েছে সিপিএমের

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গ আজ অপশাসন মুক্ত। ২০৭টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়যুক্ত করে রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু এই পটপরিবর্তনের আবহে সব থেকে কৌতূহলব্যঞ্জক বিষয় হলো সিপিএমের আচমকা প্রাণস্পন্দন শুরু হওয়া। নির্বাচনের ফলাফলে সিপিআইএম মাত্র একটি আসন (ডোমকল) পেয়েছে, আর আইএসএফ পেয়েছে একটি। এই নগণ্য প্রাপ্তি সত্ত্বেও বামমহলে যেন অকাল বসন্তের হাওয়া। একেই কি বলে 'ফাঁপা উল্লাস'?

ডোমকল বিধানসভার জয়কে বামপন্থীরা তাদের সাংগঠনিক পুনরুত্থান হিসেবে দাবি করছে। কিন্তু তথ্য ও জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই জয় কোনো আদর্শগত লড়াইয়ের ফসল নয়। ডোমকলের জয়ী প্রার্থী কেরলম্ বা অন্যান্য রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী মুসলমান ভোটারদের ব্যক্তিগতভাবে আসার আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আসা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের একচেটিয়া ভোটেই এই জয় সম্ভব হয়েছে। ডোমকলের এই ফলাফল সিপিআইএম নামক কোনো সংগঠনের জয় নয়, বরং একজন মুসলমান প্রার্থীর মুসলমান ভোটারদের ওপর ভিত্তি করে পাওয়া একটি 'কমিউনাল ডিভিডেন্ড'। বামপন্থা এখানে কেবল একটি মুখোশ, আসল কারিগর মুসলমান ভোটাররা। তারা তাদের পরিচয়টা জানে— কমরেড নয়, মুসলমান। তাই মুসলমান প্রার্থীকে নিজেদের বিধায়ক বেছে নিয়েছে। বরং বলা উচিত, এটা পলিটিক্যাল ইসলামের জয়, বামের নয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

মজার বিষয় হলো, আজ বামপন্থীরা যেটুকু নিঃশ্বাস নিতে পারছে, তা সম্ভব হয়েছে বিজেপির জয়ের ফলে। বিজেপি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বলেই প্রতিপক্ষকে তার রাজনীতি করার পরিসর দেয়। বিরোধীদের শত্রু নয়, বরং আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে। কিন্তু বামপন্থীদের ইতিহাস এর বিপরীত। ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা কখনোই অন্য রাজনৈতিক মতাদর্শকে সহ্য করে না। বিরোধী শূন্য করার নেশায় তারা বেছে নেয় পৃথিবীর সবথেকে হিংস্রতম পথ— রাজনৈতিক হত্যা। সাঁইবাড়ি থেকে মরিচঝাঁপি, তাদের হাত রঞ্জিত হয়েছে নিরীহ মানুষের রক্তে। তৃণমূল কংগ্রেসও একই পথে হেঁটেছে। তারা বামপন্থী এবং বিজেপি কর্মীদের যেমন হত্যা করেছে, তেমনি টার্গেট করেছে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদেরও। কেবলমাত্র ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাস করার অপরাধে এই রক্তপাত চলেছিল বছরের পর বছর। বাম আর তৃণমূল— উভয়েরই ভিত্তি হলো মানুষের মনে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে শাসন ও শোষণ চালানো।

এই নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে বামেদের রণকৌশল লক্ষ্য করলে এক অদ্ভুত সত্য উঠে আসে। তারা সব শক্তি ব্যয় করেছিল 'বয়কট বিজেপি', 'বাংলা বিরোধী বিজেপি' কিংবা 'বিজেপি এলে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে'— এই ভিত্তিহীন প্রচার ছড়াতে। কিন্তু একবারও তাদের মুখে শোনা যায়নি 'বয়কট তৃণমূল'। আসলে বাম নেতারা এই নির্বাচনে তৃণমূলকে একপ্রকার 'কভার ফায়ার' দিয়েছেন।

নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে 'আলট্রা লেফট' বা অতি-বামপন্থীদের সাহায্য চেয়েছেন। এই গোপন সমীকরণই হলো 'সিপেমূল'। কমিউনিস্ট তৃণমূলের এই অলিখিত জোট আসলে এক আদর্শহীন সুবিধাবাদ। এই নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় তথা তৃণমূল শাসনের পতন হওয়ার পর, বামপন্থীরা যখন বুঝল যে ভয়ের পরিবেশ বা পুরনো গুপ্ত 'সেটিং' আর চলবে না, তখনই তারা হঠাৎ নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে। তাদের লক্ষ্য এখন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হওয়া নয়, বরং বিজেপির জয়কে খাটো করে 'সেকেন্ড বয়' হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া।

বিজেপি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই 'সিপেমূল' চক্র সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। এরা আগামীদিনে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করা, শান্তি ভঙ্গ করা এবং বৈচারিক দূষণ ছড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। ভারত-বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরা পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নিঃশ্বাসরুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করবেই।

পশ্চিমবঙ্গকে যদি সত্যিকারের উন্নয়ন ও মুক্তির পথে এগোতে হয়, তবে এই ক্ষতিকর রাজনৈতিক গুপ্ত জোটকে চেনা এবং সমূলে উৎখাত করা প্রয়োজন। নিঃশ্বাস নিতে শুরু করা বামপন্থীরা আসলে আবার সেই পুরানো শ্বাসরোধকারী অপশাসনেরই মহড়া দিচ্ছে মাত্র। এদের মুখোশ খুলে দেওয়ার সময় এখনই। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৭৬)

সঙ্ঘ কী করবে?

১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে ডাক্তারজী ভ্রমণ সূত্রে কোলহাপুর যান। তখন সেখানে সঙ্ঘ 'রাজারাম স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামে চলতো। কারণ দেশীয় রাজ্যের অধিকারীরা ইংরেজের ভয়ে সঙ্ঘকে এখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কোলহাপুর প্রবাসকালে সেখানকার ডাক্তাররা তাদের সমিতির পক্ষ থেকে ডাক্তারজীকে সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেছিল। সংবর্ধনা সভায় ডাক্তারজী সঙ্ঘকার্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রাখার পরে কিছুটা সময় খোলাখুলি পরস্পর আলোচনা হয়। এই আলোচনার মধ্যে একজন ডাক্তার কোনো এক নিরাশ্রয় হিন্দু মহিলার করুণ কাহিনির কথা বর্ণনা করেন এবং জানতে চান সঙ্ঘ এ ধরনের নারীর জন্য কী করতে পারে? ডাক্তারজী বললেন--- 'এখন সঙ্ঘ কিছু করতে পারবে না। হ্যাঁ, আপনি যদি নিজে এই কাজ হাতে নেন, তাহলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।' তাহলে আপনার সঙ্ঘ কী করবে?' এই বলে সেই চিকিৎসক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ডাক্তারজী এবার একটু মুচকি হেসে বললেন— 'আপনি ভালো কথা বলেছেন। ধরুন, এক বাড়িতে আগুন লেগেছে এবং কয়েকজন বাড়ির লোকদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সেই সময় কেউ যদি বলে, বারান্দায় খুঁটিগুলোতেও আগুন লেগেছে। সেগুলোকে যদি আপনারা বাঁচাতে না পারেন তাহলে আপনাদের চেষ্টার লাভ কী? তার এ কথা বলা কি ঠিক হবে? আজ দেশের অবস্থাও এই রকম। সঙ্ঘ সমাজ জাগরণের কাজ হাতে নিয়েছে। অন্য অংশ জ্বলছে দেখে যারা কষ্ট পাচ্ছে, তারা ওই অংশে কাজ করুক। কিন্তু সংগঠিত সমাজ যতক্ষণ তৈরি হয়ে না উঠছে ততক্ষণ সঙ্ঘই সব কিছু করবে এরকম প্রত্যাশা করা উচিত নয়। আমরা এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করে চলেছি যার পর 'সঙ্ঘ কী করবে' এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই যেন না থাকে।' উপস্থিত সকলে ডাক্তারজীর এই উত্তরে খুশি হলেন এবং সংগঠন তত্ত্বের মূলভাবকে অনুভবও করলেন।

(৭৭)

শ্রদ্ধা ও একটি দৃষ্টিকোণ

ডাক্তারজীর তখন মহারাষ্ট্র প্রবাস চলছিল। একটি শাখা থেকে আর একটি শাখায়, এক কার্যক্রম থেকে পরের কার্যক্রমে। বলা যায় প্রায় ঝড়ের গতিতে এই ভ্রমণ চলছিল। প্রতিদিন বেলা ২ টায় ভোজন এবং রাত্রি ২টো পর্যন্ত জাগরণ চলত। এই ভ্রমণের মধ্যে তিনি সাতারাতেও গিয়েছিলেন। ডাক্তারজী আসছেন শুনে অভ্যর্থনার জন্য বহু স্বয়ংসেবকের সঙ্গে এক সময়কার প্রবীণ বিপ্লবী দামোদর বলবন্ত ভিড়ে স্টেশনে প্লাটফর্মে এক কোণে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। ডাক্তারজী প্লাটফর্মে নেমে সকলের মধ্যে তাকেও দেখলেন এবং চিনতে পারলেন। শাখার পর ডাক্তারজী শ্রী ভিড়ের কাছে নিজেই এগিয়ে গেলেন এবং জনসাধারণের সামনেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। এই অদ্ভুত ভাবাবেগে বিভোর হয়ে উঠলেন প্রবীণ বিপ্লবী দামোদর বলবন্তরাও ভিড়ে। সেখান থেকে ডাক্তারজী নাসিক প্রবাসে এলেন। এটা ছিল ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসের শেষের দিক। একদিন শাখার কার্যক্রম শেষ হলে ডাক্তারজী শ্রী রাজাভাউয়ের সঙ্গে উকিলের বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে তার নজরে পড়লো সেখানে একটি নতুন বসতি গড়ে উঠেছে, উৎসাহী মানুষেরা 'হিন্দু কলোনি' নাম দিয়ে একটি বোর্ডও লাগিয়েছে। ডাক্তারজীর কাছে বিষয়টা অদ্ভুত মনে হলো। তিনি রাজাভাউজী ও অন্যদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং নিজের মত ব্যক্ত করেন। 'আমাদের দেশের কোনো বসতির 'হিন্দু কলোনি' নাম দেওয়া ঠিক নয়। গতবার বোম্বাইতে গিয়ে দাদারে 'হিন্দু কলোনি' নাম দেখেছি। শ্রী বাবারাও সাভারকর ও ড. সাভারকরকে বলেছিলাম যে বোম্বাইতে 'পারসি কলোনি' হতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে 'হিন্দু কলোনি' নাম দিয়ে আমরা এই কথাই প্রমাণ করব যে আমরা যেন বিদেশি। যদি আমরা ইংল্যান্ড বা অন্য দেশে যাই এবং সেখানে আমাদের বসতি স্থাপন করি, তবে তার নাম 'হিন্দু কলোনি' যুক্তিসঙ্গত হবে। ডাক্তারজীর এই যুক্তি সবার খুব মনঃপুত হলো এবং সেই 'হিন্দু কলোনি' বোর্ড সরিয়ে দেওয়া হলো। নাসিকের সেই কলোনিটি আজ 'গোলে কলোনি' নামে বিখ্যাত।

(সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস)